ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 17, No. 2, December 2020

S R Lahiri Mahavidyalaya
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 17, No. 2, December 2020

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India
& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumder
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান
সুনির্মল বিশ্বাস ৩

অরণ্যের অধিকার ঃ নবচেতনার বিকাশে মুণ্ডাসমাজ
বিপুল মণ্ডল ৯

বাংলা রূপকথার ভগীরথ ঃ দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
সুব্রত দাস ২৬

বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাসমিশ্রিত উপন্যাসের ‘সেকাল’ ও ‘একাল’ ঃ তুলনার প্রেক্ষিতে
লিপিকা বিশ্বাস ৩৩

সময়ের স্বর ও মেঘে ঢাকা তারা ঃ প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বিচিত্রিত নিরিখে
রত্না সাহা ৪২

Humanity And The Technological Other In Metropolis And L’Inhumaine
Nabanita Karanjai 48

Unruly Mothers : Surrealism and Motherhood in Kothanodi
Nabanita Roy 58

Delineating Indian Diasporic Identities and Beyond :
Reading Select Films of Mira Nair and Deepa Mehta
Ananya Mukherjee 65

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান

সুনির্মল বিশ্বাস

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়ার আগে লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে 'ফোকলোর' ধরা হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম জন থমস লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এস্টোনিয়াম পত্রিকায় প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন। ভারত ও বাংলাদেশের অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ ফোকলোর-এর প্রতিশব্দ রূপে লোকযান, লোকবিজ্ঞান, লোকশ্রুতি, লোকচর্চা, লোকঐতিহ্য, লোককৃতি-কে গ্রহণ করেছেন। লোকসংস্কৃতির আলোচনায় 'লোক' বলতে একটি সংহত সমাজের মানুষদের বোঝায়। যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বসবাস করে, একই অর্থনৈতিক পরিকাঠামো আমৃত্যু ও বছরভর একই ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার আচার-অনুষ্ঠান রীতিনীতি পালন করে থাকে। আর 'সংস্কৃতি' হলো জীবনচর্চার অনুশীলন নির্ভর পারম্পর্যপূর্ণ উৎকর্ষতা, অর্থাৎ লোকসংস্কৃতিতে লোকসমাজের উৎকর্ষতা প্রকাশ পায়। লোকায়ত অনুষঙ্গ হল লোকসংস্কৃতিরই উপাদান। সেই উপাদানগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

বস্তুকেন্দ্রিক ঃ ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কৃষি ও শিকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, যানবাহন বাদ্যযন্ত্র।

বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক ঃ বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান, প্রথা।

খেলাধূলাকেন্দ্রিক ঃ খেলাধূলা।

বাক্‌কেন্দ্রিক ঃ লোকগান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গীতিকা, লোককথা, মন্ত্র।

অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক ঃ গাজন, ছৌ।

লিখনকেন্দ্রিক ঃ আলপনা, দেওয়াল চিত্র, পটচিত্র, কাঁথা।

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। এখানে নানা রকমের লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকশিল্প, লোকবাদ্য, লোকখাদ্য, লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোক দেবদেবী, লোকধর্ম, লোক উৎসব রয়েছে। বাংলার এই লোকসংস্কৃতিকে ঘিরেই বাঙালির জীবন ইতিহাস লিখিত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতি বা লোকায়ত অনুষঙ্গ মানব সভ্যতার অতি প্রাচীন অংশ। কিন্তু সাহিত্যে এর প্রয়োগ সেই অর্থে আধুনিক। বাংলায় লোকসংস্কৃতির চর্চা অনেক অর্বাচীন সময়ের ঘটনা। সচেতনভাবে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালির অনুরাগ রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে; বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীই বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রারম্ভিক পর্ব। গল্পকার রামকুমার মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার ভূমিপুত্র হওয়ার সুবাদে তাঁর ছোটগল্পে বাঁকুড়া ও তার পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষের জীবন, ভাষা-সংস্কৃতি উঠে এসেছে। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতি ও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে জানাটা জরুরি। রামকুমার নিজের শেকড়ের টানে ফিরে গেছেন নিজের লোকঐতিহ্যের কাছে। শৈশবকাল থেকেই রামায়ণ, মহাভারত, পাঁচালি, মনসার পালা, বাউলগান, গাজন প্রভৃতি শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজের স্মৃতিচারণায় লিখছেন—

> আমি গাঁয়ের ছেলে আর সে কারণে রামায়ণগান, কীর্তন, কথকতা, তুষুগান শুনতে শুনতে আমার বেড়ে ওঠা। কতবার কীর্তনের ধুলটির পর 'গোরাচাঁদ' হয়ে 'নগরভ্রমণে' গেছি।[১]

তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গবেষকী মন ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির এক নতুন চালচিত্র রচনা করেছে। রামকুমার গল্পে সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালকে এক সুতোয় বাঁধতে চেয়েছেন। যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিসরটি

বিশ্বাস, সুনির্মল : রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধান
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 3-8, ISSN 2249-4332

শিল্পরূপ দিয়েছেন। গল্প হয়ে উঠেছে লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার। তাই তাঁর গল্পে ছড়া, ব্রতকথা, লোকপ্রবাদ, মনসার ভাসান, গাজন, বাউলগান, লোকসংস্কারের মত লোকজীবনের নানা দিক উঠে এসেছে। গল্পের পরিবেশকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরতে আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল ব্যবহার করেছেন।

ব্রত সমাজ-জীবনের অঙ্গ। পরিবার পরিজনের মঙ্গলার্থে বাড়ির মেয়েরা ফি-বছর নানা ধরনের ব্রতপালন করে থাকে। ‘বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি’ গল্পে আমরা কুলকুলোতি নামক ব্রতের কথা পাচ্ছি। কার্তিক মাসে অল্পবয়সী মেয়েরা এই ব্রত করে। ঘনশ্যাম বাগদির মেয়ে রানি আধ সের মুড়ির বিনিময়ে ব্রতের যাবতীয় জোগাড়পাতি করে দেয়। ব্রতের খুঁটিনাটি বিবরণ গল্পকার দিয়েছেন। কলার খোলার উপর পাঁচ রকমের ফুল, পাঁচটি তুলসী পাতা, একটি প্রদীপ ও একটি ধূপ জ্বালিয়ে জলে ভাসানো হয়। রানির কণ্ঠে শোনা যায় ব্রতের ছড়াটি—

কুলকুলোতি কুলবতি
অরুণ ঠাকুর বরণে
ফুল ফুটেছে চরণে
এই ফুলটি যে তুলে
সাতভাইয়ের বুন সে।[২]

‘আকর্ষণ বিকর্ষণ’ গল্পে কালীধন চাটুজ্জের অতীতচারিতায় এসেছে পৌষসংক্রান্তির তুষখোলা ব্রতটি। কালীধন তাঁর পদ্মপিসির সঙ্গে দিঘিতে তুষখোলা ভাসাতে যেত। তুষুর গান তাঁর মনে না থাকলেও ব্রতের উপাচার হিসাবে গাঁদাফুল ও বারোটা প্রদীপের কথা মনে আছে। আবার ব্রতের সূত্রে লোকযান ভেলার প্রসঙ্গটি এসেছে। ভেলার মধ্যে বাতাসা মণ্ডার লোভে ছোট ছোট ছেলেরা মাঝদিঘি পর্যন্ত সাঁতার কাটত। যারা সাঁতরাতে ভয় পেত তারা ডাঙা থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ছড়া বলত—

সাগরে ষোলো আনা
নদীতে আধা
খালেতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ
পুকুরে গাধা[৩]

কালীধনের মনে পড়ে ছোটবেলায় তেল মাখাতে বসে মায়ের মুখের ছড়া—

নাকে কানে দেবে তেল
মধ্যে মধ্যে খাবে বেল
সকাল বিকাল দুবার যায়
তার কড়ি কি বদ্যি খায়?[৪]

নাতি অনুপমকে চিঠিতে মনুই উৎসবের কথা বলেছে কালীধন। মনুই উৎসব পৌষ সংক্রান্তির দিন পালিত হয়। নতুন চাল গুড় সহকারে রান্নার ঠাকুরকে দিয়ে গ্রামের চাষিরা ঠাকুরের ভোগ দেন। আধুনিক শহুরে এক নিউক্লিয়ার পরিবারের গল্প ‘জাহাজডুবি’। ফ্ল্যাট কালচারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গল্পকার গল্পের শুরুতে লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসাবে ছড়া ও লোকগানের ব্যবহার করেছেন। অর্কের দশ বছরের মেয়ে রিনি ছড়া কাটে—

বড়কির বোন ছোটকি
গাবদা গাবুস মোটকি
কাঁদে আঙুল মোটকে
ভাত খায় না চোটকে[৫]

ব্যক্তিমানুষের অতীত অভিজ্ঞতা পরম্পরাগত ভাবে তার সমাজে স্থান পায়। মানুষ ও জড়প্রকৃতির সম্পর্কের আড়ালে মানুষের মনে অনেক শক্তির ধারণা গড়ে ওঠে। জন্ম হয় অনেক বিশ্বাসের। যা অতীতের প্রতিকূল অবস্থায় মানুষকে রক্ষা করেছিল। তাই মানুষও সযত্নে বিশ্বাসগুলিকে হৃদয়ে লালন করেছে। লোকসমাজে বিশ্বাস ও সংস্কারের সংখ্যা নেহাতই কম নয়। সেগুলিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। লোকবিশ্বাসে সুফলদায়ী, নিষেধ ও পূর্বাভাসের মত ধারণাগুলি যুক্ত থাকে। যেখানে যুক্তিবাদী বিবেচনাবোধের অভাব সেখানে লোকবিশ্বাসের পরিমাণ বেশি।

প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুযায়ী জোড়ালাগা সাপ মারলে পাপ হয়। বরং শঙ্খলাগা বা মৈথুনকালে সর্পদর্শন শুভকর। 'সুখ' গল্পে স্বামীর মৃত্যুর পর ভৈরবের মা গ্রামের গোপালের বাড়িতে আশ্রয় পায়। কিন্তু কিছু দিন পর গোপালের বউ ঝগড়া করে তাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভৈরবের বউ ভাঙা বাড়ি পরিষ্কারকালে মিলনরত সাপ দেখতে পেলে ভৈরবের মা লক্ষ্মীলাভের আশায় ঘর থেকে লাল গামছা এনে ছুঁড়ে দেয় সাপের উপর। সর্পকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাসের পাশাপাশি গৃহস্থের কাছে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারের সংস্কারও রয়েছে। তাই এইদিন বাড়ি থেকে কাউকে তাড়াতে নেই। এই ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে গল্পে। ভৈরবের বাড়ির লোকজনকে বৃহস্পতিবার পার করে যেতে বলে। 'চমকাইতলা চলো' গল্পে দেবী চমকাই একজন লৌকিক দেবী। তাঁর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক একটি ছড়া প্রচলিত রয়েছে—

গুয়া গাছ গুয়া গাছ
মূলটি ধরে মজা
বাপ হইবেন দিল্লীশ্বর
ভাই হইবেন রাজা।[৬]

মানুষের বিশ্বাস দেবীগাত্রের ময়লা ও কবচ ধারণ করলে স্ত্রীরোগ, অর্শ প্রভৃতি রোগ থেকে মুক্তি মিলবে। দেবীর নাম প্রচার করলে কাঙ্ক্ষিত ধনের অধিকারী হওয়া যাবে। তাই দেবীকে নিয়ে পাঁচালি রচিত হয়েছে—

চমৎকারিণী মাতা।
কই আমি তব কথা।।
তোমা মাথে ঢালি জল।
তব পদে দিও স্থল।।[৭]

পশ্চিমি দেশ থেকে প্রাচ্য সাহিত্য সংস্কৃতির টানে আসা কালওয়েলের গল্প 'পশ্চিম ও পূর্ব'। গল্পে চিরায়ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রসঙ্গ এসেছে। ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখকথা পাঁচালির সুরে ধ্বনিত হয়েছে—

কার্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম
জগজনে কৈল শীত নিবারণ বসন।
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়
অভাগি ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।[৮]

চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের শ্রীপতির কমলেকামিনী দর্শনকে উপজীব্য করে 'কালিদহ' গল্পটি রচিত। রামকুমার মঙ্গলকাব্যিক আবহ সৃষ্টি করেছেন পাঁচালি সহযোগে—

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন সদাগর বুহিত্র মেলিয়া।।[৯]

'নবরত্নাকরের উপাখ্যান' গল্পে গল্পকার দস্যু রত্নাকরের মহাকবি বাল্মীকি হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। মুখোমুখি হাজির

করিয়েছেন রত্নাকর ও বাল্মীকিকে। পাঁচালির সুরে গল্পের শুরুতে নিজের আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

কনক মাতার নাম পিতা রামাঙ্গ।
বসতি গেলিয়া গ্রাম বাঁকুড়ার অঙ্গ।।
.... এ ক্ষুদ্র আখ্যান।[১০]

গান মানুষের প্রাত্যহিক কর্ম ও অবসরের সঙ্গী। বাংলাদেশ গানের দেশ। বিভিন্ন অঞ্চল, গোষ্ঠী ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী লোকগান পৃথক ঐতিহ্য বহন করে। মনের গভীর থেকে উঠে আসা ভাব ও মেঠো সুরের টান আপামর গ্রামীণ মানুষের মনে তৃপ্তি দেয়। রামকুমার গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে হরেক রকমের গানের ব্যবহার করেছেন। শহুরে নাগরিক সমাজ লোকগানকে অবজ্ঞা করলেও রামকুমার তাঁর ‘ধ্বংসস্তুপে প্রেমালাপ’ গল্পে তাকে আলাদা মাত্রায় যুক্ত করেছেন। ‘জাতিস্মর’ গল্পে রাধার মা নিজের স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে পারে না। মনোহর দাসের মেলায় গিয়ে স্বামীর নাম বোঝাতে গিয়ে কীর্তন গানের অপেক্ষা করতে হয়েছে। ‘হস্তান্তর’ গল্পে চাষি সুবল ভাল গান বাঁধতে পারে। গল্পের সূচনা হয়েছে সুবলের মুখের মনসা গান দিয়ে—

আমি কি প্রাণনাথে পাব
চাঁপাফুলের চাঁচর চুলে মাথা না বেনাব।
ভাসিতে ভাসিতে যাই গাঙ্গুড়ের জলে
লখিন্দর আচে শুয়ে বেহুলার কোলে।[১১]

সমকালীন রাজনৈতিক আবহের পরিচয় পাওয়া যায় এই গানটিতে। কংগ্রেসের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ পেয়েছে—

ওরে কংগ্রেসি পাইরে হাসি
ভোট মাগিস তুই কোন মুখে
ওরে ও রসিক নাগর বাইশ বচর
রেখেছিলি বেশ সুখে।[১২]

‘মৌজা ডোমপাটি’ গল্পে বিনোদ ডোম বাজনাবাদক। একসময় সে বিবাহ, মুখেভাত, পৈতে, যাত্রা, গাজনে বাজনা বাজাত। এখন তার ছেলে ফুলুট বাজায়। বন্ধু ভবর তৈরি পুতুলনাচের প্রথম পালায় বিনোদই সুর দিয়েছিল। সত্তরের উত্তাল সময়ে বিনোদ ভিটেমাটি ছাড়া হয়। তার গাওয়া লোকগানে ধরা পড়েছে জীবনের বিষণ্ণতা।

নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়
সুরে বেদনা বাজে গো কোনহিয়া
সুখ স্মৃতি মাঝে সুর মায়া
কত দুখ আসে যেন আলোক ছায়া
নিশীথ রাতে জাগে তারারই সাথে।[১৩]

‘বালিঘাট’ গল্পে গল্পকার জনপ্রিয় লোকগানের ব্যবহার করেছেন—ট্যাংরা তবু কাটন যায়, মাগুর মাছে ক্যাটক্যাটায়। ‘বউ, মেয়ে, অ্যালসেশিয়ান ও পাইপ’ গল্পে অবসরপ্রাপ্ত নিমাই গ্রামে এসে মঙ্গলগান শুনেছেন। বৃষ্টির জন্য ঝাঁপান গানের প্রসঙ্গ এসেছে ‘দায়বদ্ধ’ গল্পে। ‘গোষ্ঠ’ গল্পে রয়েছে বাদনা পরবের কথা। বাদনা পরবের গান শোনা যায় লক্ষ্মণের মুখে—

অহি রে এতদিন যে চরাই কাড়া।
রাতে রাতে খেলাল করি রে
আজ তোর দেখিব মর্দান
অহিরে[১৪]

‘ঘরে ফেরার গান’ গল্পে মনসাগানের প্রসঙ্গ রয়েছে। সুতোর দাম বেড়ে যাওয়া তাঁতি সম্প্রদায়ের জীবিকা নির্বাহ কঠিন

হয়ে পড়ে। রাধাশ্যামের জীবনযন্ত্রণা মনসাগানের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

একটি আমার জড়ি ছিল তালের শিকড়
ঝপ করে না খুঁজে পাই বনের আকড়
কংগ্রেসের রাজস্ব হল আমি করব কী?
খড় কেটে লবঙ্গ করি জল ফুটিয়ে ঘি
এই আমার গুণ ওগো শুন গুণীজনে
মা মনসা লয়ে খেলা কর সর্বজনে।[১৫]

সত্তরের টালমাটাল সময়ে গ্রামের চৈত্রের গাজন উৎসব উপলক্ষে যাত্রাপালা আয়োজিত হয়। যাত্রায় শোনা যায় সমবেত কণ্ঠের গান। উৎপন্ন ফসলের ভাগ দেওয়ার বিরুদ্ধে সেই গান—

আর দেব না ধান হো, কাস্তে শানাও ভাই হো, জান কবুল আর মান কবুল।[১৬]

বিদেশি সংস্কৃতির আঘাতে কীভাবে দেশীয় সংস্কৃতির অবনমন ঘটেছে সেদিকেও গল্পকার দৃষ্টিপাত করেছেন। 'সম্পর্ক' গল্পে কুণ্ডুদের বাড়ি খোলকীর্তনের দল ফিল্মি গানের সুরে নামকীর্তন গায়। গল্পে রয়েছে—

> "এবার একটা জোর মচ্ছব দিল কুণ্ডু। মাইক বাজল। পাঁচ গাঁ থেকে খোল কীর্তনের দল এল। তবে আরামবাগ থেকে একটা দল এসেছিল বটে। ও ননদি আর দুমুঠো চাল ফেলে দে হাঁড়িতে', তারপর 'হামদো এক কামরা মে বন্ধ হ্যায়', আবার 'তাকি রে তাকি'র সুরে 'জয় রাধা গোবিন্দ জয় জয় রাধে' গান গাইল। ছেলে ছোকরারা পর্যন্ত সুরের তোরে হাততালি দিতে দিতে ঠাকুর নাম করল।"[১৭]

'নিত্যগোপালের প্রত্যাবর্তন' গল্পেও নিত্যগোপালের দেখাদেখি গ্রামের ছেলেরা গাজনে মেতে উঠেছে। ছেলেরাই বাড়ি বাড়ি চাল, আলু, পটল, মুড়ি তুলে আনে। গোবিন্দ মহাদেব সাজে। হরি গোঁফ দাড়ি কেটে পার্বতী সাজে। ঢাক, বাজি বাজনা ও মাইক সহকারে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। 'শরীরের ভাঙাগড়া' গল্পে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনে পাঁচ গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়। গাজনের বর্ণনা—

> "মাথায় তেল নেই। গায়ে খড়ি ওঠে। গলা থেকে ঝুলতে থাকে উত্তরীয়। হাতে বেত, শরীরে সবারই একখণ্ড কাপড়। প্রায় উপবাসে কেটেছে সারাটা মাস। পাঁচ গাঁয়ের ভক্তরা এই মিলনের প্রতীক্ষাতেই দিনগুলো কাটিয়েছে। বেজেছে দিন-গাজনের ঢাক।"[১৮]

লোকভাষা, লোকশিল্পের পরিচয় মেলে 'শিল্পী' গল্পে। গ্রামের মেয়েদের হাতের স্পর্শে বাড়ির দেওয়াল সেজে ওঠে। গিরিমাটি, পলতা, কাপড়ে দেওয়া নীল বড়ির রং, আলতা, সিঁদুর, লণ্ঠনের কালি মিশিয়ে তারা আঁকার কালি প্রস্তুত করে। ঝুমুর গানের রাধার যমুনায় জল আনার দৃশ্য ফুটে ওঠে তাদের দেওয়ালে। এক ব্রাহ্মণ পরিবারের অভাব অনটনের গল্প 'হাভাতে'। কলকাতা যাবার সময় টেলু ঠাকুরের ছেলে ডিঙলের খাওয়া দেখে গোবিন্দ গয়লার প্রবাদবাক্য—বামুন ঘরের ছেলে, কপাল ছাড়া শালাদের সবটাই পেট।[১৯]

৩

বর্তমানে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে প্রাচীন ধারার লোকসংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে। কিন্তু অন্যান্য গল্পকারদের মত রামকুমারও লোকসংস্কৃতিকে আঁকড়ে বাঁচতে চেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে গ্রাম ও গ্রামীণ জীবনের একটি আত্মিক যোগ রয়েছে। তাই তিনি অনায়াসে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিকে সাহিত্যে স্থান দিতে পেরেছেন। বিস্মৃতির অতলের হারিয়ে যাওয়া বাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করেছেন। লোকসংস্কৃতি তাঁর গল্পের পরিবেশ পাত্র-পাত্রীদের জীবন্ত করে তুলেছে। সামাজিক সমস্যা, লৌকিকতা তাঁর গল্পের সমাজজীবনের নানান দৃশ্য অকৃত্রিম জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে। এই অকৃত্রিমতাই তাকে অনন্য গল্পকারের মর্যাদা দিয়েছে। মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার-বিশ্বাস, লোকায়ত জীবনের

চিত্রকে তিনি সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে গেছেন। গল্পের কাহিনী বিন্যাসে, ঘটনার পরিণতি, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ সবকিছুর মধ্যেই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যুক্ত হয়েছে। লোকসংস্কৃতির প্রভাব তার গল্প-সাহিত্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে একে আলাদা করে দেখা অসম্ভব।

সূত্রনির্দেশ

১. ভূমিকা, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
২. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্পসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৩১।
৩. তদেব, পৃ. ১৩৯।
৪. তদেব, পৃ. ১৪৩।
৫. তদেব, পৃ. ৩৬০।
৬. তদেব, পৃ. ৫১৩।
৭. তদেব, পৃ. ৫১৫।
৮. তদেব, পৃ. ৪০৮।
৯. তদেব, পৃ. ৫২৭।
১০. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১১. তদেব, পৃ. ১৭৩.।
১২. তদেব, পৃ. ১৭৮।
১৩. তদেব, পৃ. ২২৪।
১৪. তদেব, পৃ. ৭৭।
১৫. তদেব, পৃ. ২০০।
১৬. তদেব, পৃ. ১৯৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৭১।
১৮. তদেব, পৃ. ২৬৫।
১৯. তদেব, পৃ. ১৪।

সুনির্মল বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ,
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খণ্ড।

অরণ্যের অধিকার : নবচেতনার বিকাশে মুণ্ডাসমাজ

বিপুল মণ্ডল

বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবাদ প্রতীম ঔপন্যাসিক মহাশ্বেতা দেবী। তিনি বাঙালির সমাজ-মনন-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, আদি জনজীবন-লোকমানস, কৃষ্টির প্রতি তাঁর নাড়ির যোগ, সাহিত্য বা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরল-ব্যতিক্রমী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। মহাশ্বেতা চলমানতায় বিশ্বাসী, তাঁর জীবন সতত সুখাস্তীর্ণ ছিল না, তথাপি অতীত থেকে বর্তমান আবার বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে গিয়ে তাঁর গতিময়তার ভাঁটা পড়েনি, বরং তা দুর্বার হয়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতার জীবনে কেবল লেখালেখি নয়, আর এক জীবন মহাকর্মযজ্ঞে ভরপুর, ব্যাপ্তির সীমানা ছাড়িয়ে বহুব্যাপ্ত তাঁর আদিবাসী উন্নয়ন তথা তাদের আর্থনীতিক মুক্তি পরিকল্পনার বিষয়সমূহের পরিধি। প্রতিটি দেশ ও জাতির সঙ্গে প্রতিটি দেশ ও জাতির পারস্পরিক ভাববিনিময় বা সংস্কৃতির আদান-প্রদান একান্ত জরুরি, যেহেতু এর মধ্যে দিয়ে একটি জাতি আর এক জাতির প্রতি ঘৃণা-হিংসা-দ্বেষ ভুলে প্রেমের আলিঙ্গনে একাত্ম হতে সক্ষম। মহাশ্বেতা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকল্পে যেখানে ডাক পেয়েছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন, আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন অন্তরের উৎসাহ ও অদম্য প্রেরণায়।

মহাশ্বেতা দেবীর অন্বেষণ জীবনের গভীরে, তাঁর অন্বেষণ ও নিষ্ঠা শিল্পকর্মের মধ্যে তন্নিষ্ঠ থেকে, আপন অনুভূতির গহনে। সেখানে বহির্জগত বা কর্মজগৎ ও শিল্প বা সৃষ্টির জগৎ পরস্পর এক সূত্রে গ্রথিত তথা মেলবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ। এ সম্পর্কে সমালোচক অভিজিৎ সেন মন্তব্য করেছেন,

> ''মহাশ্বেতা দেবীর ব্যক্তি জীবন এবং সাহিত্যজীবন যেন ওতপ্রোতভাবে, সাহিত্যকর্মী মহাশ্বেতা এবং সমাজকর্মী মহাশ্বেতা যেন একে অপরের পরিপূরক।''[১]

মহাশ্বেতা দেবী সমাজকল্যাণমূলক কাজ ও নবতর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বহু পুরস্কারে ভূষিত ও সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার সমাজকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত ও সম্মানিত করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) এর জন্য ১৯৭৯ সালে 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এছাড়া তিনি বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ বহু খেতাব, সম্মান লাভ করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'লীলা পুরস্কার', 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক' (১৯৭৮), 'ভুবনমোহিনী দেবী পদক' (১৯৮৩) লাভ করেন এবং নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রদত্ত 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য স্বর্ণপদক' (১৯৮৯), 'জগত্তারিণী পদক' (১৯৮৯), 'বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ পুরস্কার' (১৯৯০), 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার' (১৯৯৬), 'ম্যাগসাইসাই পুরস্কার' (১৯৯৭) এবং দিল্লী থেকে 'ইয়াসমিন স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৯৮) ভূষিত হন।

অন্যান্য সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ও ডিগ্রির সংখ্যা কম নয়। তিনি লাভ করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত 'সাম্মানিক ডক্টরেট' (১৯৯৮) ডিগ্রি, বোম্বে, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত 'ফেলোশিপ' (১৯৯৮), বিশ্বভারতী প্রদত্ত 'দেশিকোত্তম' (১৯৯৯), কানপুর, ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রদত্ত 'সাম্মানিক ডি. লিট' (২০০০) , বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পুরস্কার (২০০১), ভারতীয় ভাষা পরিষদ সম্মাননা (২০০১) এবং গান্ধী-আম্বেদকর ট্রাস্ট প্রদত্ত 'জ্যোতিবাপুলে সম্‌ত পুরস্কার' (২০০৩)।

বাংলার সমাজ ইতিহাসের প্রতি মহাশ্বেতা সুগভীর আগ্রহের কথা বার বার ব্যক্ত হয়েছে। যে ইতিহাসের প্রতি

মণ্ডল, বিপুল : অরণ্যের অধিকার : নবচেতনার বিকাশে মুণ্ডাসমাজ
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 9-25, ISSN 2249-4332

মহাশ্বেতার প্রভূত আকর্ষণ, যে ইতিহাসের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, সে ইতিহাস দেশের অতীত রাজ-রাজড়ার কাহিনী নয়, সে ইতিহাস দেশের সমাজবদ্ধ অন্ত্যজশ্রেণী বা নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-যাপন-চেতনা, আচার-প্রথা-সংস্কার, ধর্মবিশ্বাস, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজ-জাতি-গোষ্ঠির উত্থান-পতন, শোষণ-পীড়ন ও তাদের প্রতিবাদী চেতনা ইত্যাদি নিয়ে অতীত বা বর্তমানের ঘটনাবৃত্ত এবং এসব নিয়েই মহাশ্বেতার ভাবনা-অনুধ্যান, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা, দায়বদ্ধতা যা তাঁর জীবনের একান্ত অঙ্গীভূত। তিনি মনে করেন,

> ''একটি দেশের সমাজনীতি ও অর্থনীতির প্রকৃত অর্থ হল সে-দেশের লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবন-ব্যবস্থা।''[২]

তাই বলা যায়, গণমুখী জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাঁর স্বকীয় জীবনবোধ থেকেই উৎসারিত এবং সেই উৎসমুখ থেকে সৃষ্ট উৎকৃষ্ট ফসল—'কবি বন্দ্যঘাটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭), 'অপারেশন ? বসাই টুডু' (১৯৭৮), 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' (১৯৮৩), 'শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা' (১৯৮১), 'অক্লান্ত কৌরব' (১৯৮১), 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' (১৯৮৯), 'প্রথম পাঠ' (১৯৮৯) প্রভৃতি উপন্যাস।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ছোটনাগপুর ও পালামৌ অঞ্চলের তথাকথিত নানা আদিবাসী জনকোমগোষ্ঠী যাদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ইতিহাসের নবতর অধ্যায়, যেমন—'বেরেলি বিদ্রোহ' (১৮১৬), 'কোল বিদ্রোহ' (১৮৩১-৩২), বারাসাতে সৈয়ত আহমদ ও তিতুমীরের নেতৃত্বে 'ফরায়েজি বিদ্রোহ' (১৮৩১), 'মোপলা বিদ্রোহ' (১৮৪৯, ১৮৫১-৫২ ও ১৮৫৫), 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' (১৮৫৫-৫৬) এবং রাঁচী অঞ্চলে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে 'মুণ্ডা' বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০) খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্যই গণমানুষের চেতনাকে প্রতিবাদী করে তোলে। মহাশ্বেতা আর্থনীতিক বৈষম্যের শিকার তথাকথিত আদিবাসী সমাজের আর্থনীতিক সংকট দূর স্বপ্নে বিভোর এক 'কর্মী লেখক'। ভারতের তথাকথিত আদিবাসী জনকোমগোষ্ঠির সঙ্গে নানা সূত্রে তাঁর সংযোগ ঘটেছে। তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলিটিও সুসমৃদ্ধ। একদা মহাশ্বেতা কিছুকাল মেদিনীপুরের বাসিন্দা ছিলেন। সেই সূত্রে মেদিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার আদিবাসী ও সেই জেলার তপসিলীভুক্ত জাতির সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটে। ক্রমে মহাশ্বেতা বাংলা-বিহার-ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকলেন। এ সম্পর্কে বিজিতকুমার দত্ত 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন,

> ''পরিচয়ের প্রথম পর্ব শেষ করে ধীরে ধীরে মহাশ্বেতা তাদের জীবনযাপনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেন। খানিকটা স্বেচ্ছাব্রত নিলেন এদের উন্নয়নকর্মে। ফলে ঘটতে লাগল তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই তপসিলীভুক্ত ও আদিবাসী সমাজের ইতিহাস পরতে পরতে ভুলে যেতে লাগল তাঁর সামনে। সেই ইতিহাসের বাঁকচুরগুলি যে জীবনকে বয়ে নিয়ে এসেছে একালে তাদের প্রতি উপেক্ষা আর অত্যাচার তাঁকে যন্ত্রনা দিয়েছে। তিনি সেই যন্ত্রনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন নানা অভিযোগ দাখিল করে, কিছুটা কাজকর্ম করে, এখনও করেছেন, আর যেহেতু তিনি লেখক সেই হেতু লেখ্যকর্মে তাকে রূপ দিতে চাইলেন।''[৩]

আবার মহাশ্বেতা সম্পর্কে সুবোধ দেবসেন বলেছেন,

> ''বিহার ও ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তথাকথিত মুণ্ডা আদিবাসী সমাজের চোখে মহাশ্বেতা 'মারাং দাই, হো-গোষ্ঠির মানুষের কাছেও 'আজিম' তিনি। লোধা সমাজের মানুষ শ্রদ্ধাভরে তাঁকে চিঠি লেখেন।''[৪]

বস্তুত, আদিবাসী সমাজজীবনের প্রতি সহমর্মিতাবোধ ও একাত্মতা লাভের পথটি সুগম করতে যখন তিনি আত্মস্থ-মগ্ন, তখন নিজের কোনো ক্ষতিই তিনি ক্ষতি বলে আমল দিতে চাননি। তাই গ্রামীণ জীবন তথা নিম্নবর্গ, অবহেলিত শোষিত আদিবাসী মানুষজন ও আদিবাসীকল্যাণ বা সংগঠনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্বাভাবিক ও দুর্বার হয়ে উঠেছে।

মূলত, মহাশ্বেতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ গড়ে ওঠে মেদেনীপুরের লোধা-শবর ও পুরুলিয়ার খেরিয়া -শবর, রাঁচি-পালামৌ অঞ্চলের মুণ্ডা-ওরাওঁ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে। লক্ষনীয়, মুণ্ডা-ওরাওঁরা ভক্তি অবনম্রচিত্তে 'করম' অনুষ্ঠানে তাদের একান্ত আপনজন অসুস্থ 'দিদি'-র আরোগ্য ও মঙ্গল কামনা করে থাকে।

মহাশ্বেতা দেবী স্পষ্টতই উপলব্ধি করেছেন আদিবাসী সমাজের মধ্যেকার ধর্ম-বর্ণ-সংস্কারগত অচলায়তনের প্রাকার ভেঙ্গে চুরমার করা ও তাদের আর্থনীতিক মুক্তি সংগঠন একান্ত জরুরি। সম্ভবত, সমাজ-সংস্কৃতি তথা জীবনধারার মূলস্রোতে তাদের মিলিয়ে দিতে হলে প্রাথমিক শর্ত হল তাদের আর্থনীতিক দুর্বলতা দায়িত্ব-কর্তব্য সচেতনতা তথা বৈপ্লবিক চেতনার পর্যায়ভুক্ত। মহাশ্বেতা এহেন উপলব্ধি থেকেই ভারতের তথাকথিত আদিবাসী সমাজকে সভ্য জগত বা সুস্থ সবল জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে শপথ নিয়েছেন।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহাশ্বেতার অনমনীয় মনোভাব তাঁর কাজেও লেখায় সমুজ্জ্বল। তাঁর বিখ্যাত 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসে নায়ক বিরসা ও ধানী মুণ্ডার মধ্যে সামাজিক বঞ্চনা-অধিকারহরণ ও শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদীসত্তার উদ্‌ঘাটন ও তাদের প্রতিরোধ চেতনার সমুন্নত, শিল্পীত রূপ দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। কেবল মুণ্ডা জাতির মুক্তি নয়, অরণ্যের সমস্ত আদিবাসীর (সাঁওতাল-ওরাওঁ-কোল-হো প্রভৃতি) মুক্তির জন্য বিরসা অরণ্যের অধিকার দাবি করে। শোষকের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ভয়াল রূপ ধারণ করে, সে ডাক দেয় মহাবিদ্রোহ বা 'উল্‌গুলান'-এর।

আমাদের আলোচ্য 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৭৭) উপন্যাসে তথাকথিত মুণ্ডা আদিবাসী বা আদি জনজাতির সংগ্রামী বিপর্যস্ত জীবনের চিত্র কিভাবে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা তা পর্যালোচনা করব। তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব তথা সমাজবাস্তবতার যথাযথ চিত্রাঙ্কনে ঐতিহাসিক সূত্র ও তথ্যাদি অনুসন্ধানে ব্যা পৃত থেকেছেন। উক্ত উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা অংশে লেখিকার অকপট স্বীকারোক্তি—'এই উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত 'Dust and storm and Hanging Mist' বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হত না।'[৫] ইতিহাস তথ্য ও পরিপূর্ণ জীবন তথা বিপর্যস্ত মুণ্ডাদের সংগ্রামী জীবন ও চেতনার সংযোগে লিখিত 'অরণ্যের অধিকার' যে মর্মস্পর্শী, পাঠকের কাছে সবিশেষ আকর্ষণীয় তা বলাই বাহুল্য। মূলত, উপন্যাসের মূল কাহিনী বিরসা মুণ্ডার 'অরণ্যের অধিকার' ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ের-ই ইতিবৃত্ত।

১৮৯৯-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচী অঞ্চলে বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে যে ব্যাপক আদিবাসী আন্দোলন সংঘটিত হয়—তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। মুণ্ডারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার শিকার। ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকেই মুণ্ডাদের জমি জায়গা দখল করতে থাকে, উত্তর ভারত থেকে আসা জায়গিদার, ঠিকাদার, বণিক ও মহাজনরা। সেই সঙ্গে চলে মুণ্ডা শ্রমিক সংগ্রহ করার জন্য নির্মম অত্যাচার। অন্যদিকে, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকে। কিন্তু জমি সংক্রান্ত সমস্যা অমীমাংসিত থেকে যায়। ১৮৯০-এর দশকে মুণ্ডা সর্দাররা আদালতে বিদেশী জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায়, মুণ্ডারা বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে বিদ্রোহে সামিল হয়। মুণ্ডাদের মধ্যে রাষ্ট্র বিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে—এই অভিযোগে বিরসাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তার দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বিরসা নতুন করে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয়।

ব্রিটিশের নির্মম অন্যায়-অবিচার, হীন মনোভাবের বিরুদ্ধে উপন্যাসের নায়ক বিরসা প্রতিবাদে মুখর, সে 'উল্‌গুলান'-এর ডাক দেয়। ১৮৯৯-এর ডিসেম্বরে বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডারা 'উল্‌গুলান'-এ সামিল হয় এবং তাদের এই বিদ্রোহ ছিল খুবই জোরদার। এই মাসেই প্রথমে তারা গির্জার ওপর হামলা শুরু করে। এরপর আক্রমণ করে পুলিশ এবং থানার ওপর। শেষ পর্যন্ত মুণ্ডা বিদ্রোহ দমন করা হয়। বিরসা গ্রেপ্তার হয় এবং কারাগারে তার মৃত্যু হয়। মহাশ্বেতা তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাদের 'উল্‌গুলান'কে সিধু কানুর নেতৃত্বে জোটবদ্ধ সাঁওতালদের (১৮৫৫-৫৬ সালের গণবিদ্রোহী) 'হুল' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। পরে অবশ্য ব্রিটিশ সরকার মুণ্ডাদের অভাব অভিযোগ নিরসন কল্পে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে

ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করে, মুণ্ডাদের 'খুটকট্টি' অধিকার স্বীকার ও বেগার প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটি যেন মুণ্ডা বিদ্রোহের এক তথ্যপূর্ণ দলিল। ঔপন্যাসিক এখানে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিরসা মুণ্ডা ও তার বিদ্রোহের কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে সমাজের প্রতি মহাশ্বেতা দায়বদ্ধ তা স্বীকার করে বলেছেন—

> ''লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকার বদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না। আমার বীরসাকেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।''[৬]

মহাশ্বেতা দেবী মুণ্ডাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের জীবনের নানান ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও প্রত্যক্ষ করেছেন কাছ থেকেই। তিনি হৃদয় দিয়ে তাদের হৃদয়ের কথা অনুভব করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতার দর্পণে ধরা পড়েছে মুণ্ডাদের দারিদ্র, তাদের প্রতি উচ্চবর্গের ঘৃণা-বঞ্চনা, অপাঙ্‌ক্তেয় পতিত জীবনের দুঃসহ জ্বালা-যন্ত্রণা ইত্যাদি। অন্ত্যজবর্গের মুণ্ডা জনজাতি গোষ্ঠির বিদ্রোহ কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কারণ তাদের বিদ্রোহী চেতনার পশ্চাতে জড়িয়ে রয়েছে সুদীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস। মহাশ্বেতা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাদের দুঃসহ জীবনের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির উপকরণে পুষ্ট তাদের সাংস্কৃতিক জীবনকেও তুলে ধরেছেন অতি মমতার সাথে। বিরসা চরিত্রটির মধ্যে ফুটে উঠেছে মুণ্ডা জীবনের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা, মুণ্ডাদের সুখী-সুস্থ-স্বচ্ছন্দ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ঐকান্তিক বাসনা। বলা যেতে পারে, বিরসার ধর্মীয় সংস্কার-আন্দোলন, অলৌকিক ক্ষমতা সমৃদ্ধ চেতনা, প্রতিবাদ প্রবণতা, স্ব-সমাজ ও স্ব-জাতিকে সংহত করার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া বা নেতৃত্বদান প্রভৃতি গণমুখীজীবন প্রতিষ্ঠারই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

অরণ্যচারি জাতিমাত্র সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর। মুণ্ডারাও প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম, তাদের সহজাত প্রবৃত্তি অরণ্য প্রকৃতি মতই শান্ত-স্নিগ্ধ, জটিলতাহীন, সহজ-সরল অথচ বলিষ্ঠ। তাদের জীবনমান অতি নগন্য, জীবন প্রকৃতি, পশুপাখি-প্রাণীকুল মিলেমিশে যেন একাকার। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র বিরসা লাউয়ের খোল দিয়ে 'টুইলা' বানায়, বাঁশি বানায়, তার বাঁশির শব্দে বনের পশুপাখি বশ মানে। তার বাঁশির সুর অন্যান্য মুণ্ডাদের থেকে একেবারে আলাদা, তার হৃদয় উৎসারিত সে সুরে যেন যাদু আছে। কিশোর বিরসা অরণ্যের অনাড়ম্বর মুক্ত জীবনের প্রতীক সে প্রকৃতির মতো মুক্ত জীবনের সৌন্দর্যে দীপ্ত। বিরসা তার মায়ের সামনে তার পারদর্শিতার প্রমাণ দেয়,

> ''বিরসা টুইলা বাজাতে থাকল টুং টাং টুং টাং। খুব ছোট আলতো টোকা মেরে বাজাতে থাকল সন্ধ্যার বাতাসে সে টুং টাং টুং টাং মিশে গেল, যেন সন্ধ্যার সঙ্গে এক হয়ে গেল।''[৭]

বিরসার মা এমনটাই তো চায়, তার ছেলে আর দশটা মুণ্ডা সন্তানের মতো প্রকৃতির বুকে অরণ্যের মধ্যে বাঁশি বাজিয়ে, 'গাই চরাই' করে বড় হয়ে উঠুক, এই জীবিকা নিয়ে সে বেঁচে থাকুক। বিরসার মাসি জোনি এবং মেসো পর্যন্ত চায়না বিরসা লেখাপড়া শিখুক, প্রকৃতি থেকে, অরণ্যচারি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। তার মেসোর ধারণা বিরসা লেখাপড়া শিখলে নির্ঘাৎ দিকু হয়ে ভবিষ্যতে মারা পড়বে। বিরসার মা-মেসোর কাছে মুণ্ডা জীবনের বাইরে ভিন্ন জীবনের কথা ভাবাটাই মহাপাপ। কিন্তু বিরসা অন্য জাতের মুণ্ডা, অন্য ধাতের মানুষ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিরসার মধ্যে জমে ছিল প্রতিবাদের আগুন, অঙ্কুরিত হয়েছিল 'উল্‌গুলান' বা মহাবিদ্রোহের বিপ্লব যা তাদের কাছে মহাপাপেরই নামান্তর।

উপন্যাসের নায়ক বিরসা কেবল মুণ্ডা জাতির মুক্তির জন্য নয়, অরণ্যের সমস্ত আদিবাসীর সাঁওতাল-ওরাওঁ-কোল-ভীল-হো প্রভৃতি অন্ত্যজবর্গের মানুষের মুক্তির জন্য অরণ্যের অধিকার দাবি করে। তাই তার ডাক জমিদার- জোতদার এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে 'উল্‌গুলান' বা মহাবিদ্রোহের। অরণ্যের সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠি কেবল তাদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে—তাই তাদের বিদ্রোহ 'হুল', আর মুণ্ডা সর্দারদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে সে লড়াই তা হল তাদের 'মূলকই লড়াই' কিন্তু বিরসার লড়াই সকল উপজাতিগোষ্ঠির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই—'উল্‌গুলান'।

'দিকু' তথা জমিদারদের কাছ থেকে অরণ্যকে ছিনিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে বিরসা। সে মুণ্ডা সমাজের মানুষের কাছে ভগবান স্বরূপ। দিকুরা মুণ্ডাদের অরণ্য জননীকে অপবিত্র করেছে। সুতরাং বিরসা মুণ্ডা উল্‌গুলানের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে অরণ্য জননীকে পরিশুদ্ধ করতে অঙ্গিকারবদ্ধ। বস্তুত, এই শুদ্ধিকরণের চেতনা আসে বঞ্চনা-শোষণ জীবনের কলঙ্কময় গ্লানি থেকে।

বস্তুত, মহাশ্বেতা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডারি লোককথা ও পুরাণ অনুসরণ করে তাদের জীবনের প্রতি স্তরে দেখিয়েছেন তাদের আরণ্যক জীবনের আদিম সরলতা, ধর্মীয় সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সিংবোঙার কাহিনী, দেংগেলদার আগুনে পৃথিবীর জ্বলে যাওয়া, দুষ্ট আত্মা, নাসানবোঙা, ডাইন-ওঝা-গুণিন প্রভৃতি মুণ্ডা সমাজের ধর্মবিশ্বাসের প্রাচীন ও বিচিত্ররূপ।

মুণ্ডা বিশ্বাসে আদি দেবতা হরম্ আসুল, প্রধান দেবতা সিংবোঙা—এছাড়া বুরুবোঙা, ইকির বোঙা ও আরো অপ্রধান কিছু বোঙা শক্তির কাছে অশুভ-অকল্যাণ থেকে মুক্তি ও শুভ কামনায় পূজার্ঘ্য, বলি ইত্যাদি নিবেদন বা উৎসর্গ করা হয়। স্বভাবত মুণ্ডা সমাজে এসকল দেবতা শুভঙ্কর বোঙা-এঁরা 'হাটু বোঙাকো', 'ওড় বোঙাকো' নামে প্রসিদ্ধ। মুণ্ডাদের অনিষ্টকারী বোঙা 'নাসান্ বোঙা' (রোগশোকের দেবতা), 'নাগ-ইরা' (কুষ্ঠরোগের দেবতা)—এঁদের কুনজর থেকে আত্মরক্ষার জন্য বা অশুভ শক্তিকে বশে আনার জন্য ওঝা, দেওড়া পাঠক, সোখা-পহানদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি থাকে না। মুণ্ডা সমাজে সাধারণের এহেন বিশ্বাস-সংস্কারবশত ধর্মের আচারগত নঞর্থক প্রতিক্রিয়া বিস্তার লাভ করে।

হিন্দুসমাজের মতো মুণ্ডাদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ—এসব উৎসবের মধ্যে কারাম পরব, সারহুল পরব, দাসাই, সোহরায়, বাহা, করম্, মাগে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মুণ্ডাদের সিংবোঙা, মাংরাঙবুড়ো, হরম আসুল, বুড়াবুড়িবোঙা, হারান বুড়িয়া বোঙা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা-উৎসবের সঙ্গে হিন্দুদের বিবাহ, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, দেওয়ালি, রামনবমী ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠান একাত্মতা লাভ করেছে এবং মুণ্ডা দেব-দেবীর একাসনে ঠাঁই লাভ করেছে রাধা-কৃষ্ণ, হর-পার্বতী, রাম-হনুমান প্রভৃতি দেব-দেবীরা।

উল্লেখ্য, মুণ্ডাসমাজের অন্তরস্থিত সংস্কারের জটিল জাল ছিন্ন করে তাদের সংস্কারহীন, স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিরসার প্রচেষ্টা ও একাগ্রতা অন্তহীন, তার শিক্ষা-দীক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি থেকে তা সহজেই অনুমেয়। বিরসা বিদ্যার্জন করতে বুরজুমিশনে ভর্তি হয়। সেখানকার পড়া শেষ করে চলে গেল চাইবাসায়। সেখানে ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষা, কায়দা-কেতার মধ্যে সে উপলব্ধি করে মিশন কখনো মুণ্ডাদের স্বার্থের অনুকূল নয়। মিশনের প্রতি ভরসা রাখা বৃথা। মুণ্ডাদের পুরাণকথায় সিংবোঙার অনাচার থেকে মুক্তির পথ, সেংগেলদায় ভরসা রাখতে পারে না সে। সে অস্থিরচিত্তে বন্দগাঁও-তে চলে যায় আনন্দ পাঁড়ের কাছে। সেখানে সে পৈতা নেয়, চন্দন মেখে তুলসীর পূজা করে, রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের কথা শোনে, নিজে পাঠ করে—কিন্তু আনন্দ পাঁড়ে বিরসার সরকার বিরোধিতার জন্য তার কাছে ঠাঁই দেয় না। ইতিমধ্যে সরকারের নির্দেশে অরণ্যচারি মানুষ তাদের সব অধিকার হারায়। তখন বিরসা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়, কিন্তু তার প্রতিবাদ ও আর্জির কোনো মূল্য থাকে না। ফলে সিংবোঙা, ঠাকুর দেবতা থেকে ধার্মিক বা মহান ব্যক্তির উপর আস্থা চলে যায়। সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে নিজেকে নতুন ধর্মের প্রবক্তা রূপে ঘোষণা করে। মুণ্ডাদের সর্বপ্রকার বন্ধন ঘোচাতে, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে সে 'ধরতি-আব'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বিরসা তার একেশ্বরবাদের সঙ্গে নতুন চেতনা-রীতির প্রচারে সীমাবদ্ধ থাকা একমাত্র পথ বলে মনে করলো না। তার অরণ্য জননীর দুঃখ-যন্ত্রণা ও লজ্জা ঘোচানোর সংকল্পে সে অটল থাকল। সে 'মুণ্ডারাজ' প্রতিষ্ঠার ডাক দিল। এখানেই তার ধর্মনীতির সঙ্গে রাজনীতির মেলবন্ধন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিরসার দ্রোহবাণী 'উল্‌গুলান' সে উল্‌গুলানের ডাক দিয়ে 'বিরসারাজ' প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হল। তবে মুণ্ডাবিদ্রোহ যে পটভূমিতে অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছে, তার সঙ্গে ধর্ম-বিশ্বাসের যোগ ও পরবর্তী উত্তরণের বিষয়টি যথাযথ বিকাশ তথা সুস্থির পথনির্দেশে সক্ষম হয়নি।

বস্তুত, 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বিরসা ধর্মের মূলতত্ত্ব সম্পর্কিত কোন ভিত্তির ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মুণ্ডারা প্রকৃতির বুকে একাত্ম হয়ে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের দুর্জ্ঞের জটিল রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। আদিবাসী সমাজে সর্বঘটে সর্বশক্তিমান একেশ্বরের স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মূলত, তাদের ধর্মবিশ্বাস এক সুগভীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রয়োজন থেকেই পরিপুষ্ট। উপন্যাসে বিরসাকে হিন্দু পুরাণের অবতারের সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। শোষণ-পীড়নের হাত থেকে মুণ্ডাসমাজকে মুক্ত করতে কালো মানুষের ঘরেই আবির্ভূত হবে 'অনার্য কৃষ্ণ'। বিরসা যে সেই অবতার 'অনার্য কৃষ্ণ' তা মুণ্ডা বিশ্বাসে স্থানপ্রাপ্ত। সমগ্র উপন্যাসে এহেন বিশ্বাস-সংস্কার অদৃশ্যে ও প্রধান চরিত্রের মধ্যে নির্দেশিকা রূপে তথা কাহিনী নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

কৃষির উপর নির্ভরশীল কৃষকরা এবং তাদের অধিপতিগণ অর্থাৎ সর্দার বা রাজগণ শাসক-শোষকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ব্রিটিশ সৈন্য, পুলিশ, জমিদার-মহাজন প্রভৃতির বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ গড়ে তোলে। এভাবে সংঘটিত হতে দেখা যায় সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ, রংপুর কৃষক বিদ্রোহ, ওড়িশায় পাইক বিদ্রোহ, রাজমহলে তিলক মাঝির বিদ্রোহসমূহ। এরকমই ইতিহাসের অধ্যায় হিসাবে রচিত ১৭৯৯ সালের চুয়ার বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম রূপে গণ্য 'সিপাহী বিদ্রোহ'। মূলত এই বিদ্রোহ সমূহের প্রবহমান ধারায় সংঘটিত হয় বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বাধীন ঐতিহাসিক 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'।

সম্ভবত, মুণ্ডা আদি জনজাতি গোষ্ঠিই প্রথম আদিবাসী জনজাতি, যারা ঔপনিবেশিক চাপের বিরুদ্ধে এবং ভূমিসংক্রান্ত অধিকার বঞ্চনার বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেছে। তারা ভূমিব্যবস্থা ধ্বংসের বিরুদ্ধে ১৮১৯-২০ সালে তামার বিদ্রোহ এবং ১৮৫০ সাল থেকে সংঘটিত ছোটনাগপুর বিদ্রোহে অংশ নেয়। ১৮৫৮ সাল থেকে চল্লিশ বছরব্যাপী 'সারদার বিক্ষোভ' বা 'মুলকি লড়াই'-এর একমাত্র লক্ষ্য জমিদারদের বিতাড়ন ও বেগার প্রথার উচ্ছেদ সাধন। স্বভাবত, মুণ্ডারা অরণ্য সাফাই করে জমিতে আবাদ শুরু করে, জঙ্গলেও ছিল তাদের অবাধ বিচরণের অধিকার। তারা গ্রাম পত্তন করে এবং বংশধররা ভোগ করে 'ভুঁইহারি', জমি। মুণ্ডাদের অভাবের সুযোগ নিয়ে বহিরাগত 'ইলাকদার' ছলে-বলে-কৌশলে তাদের বংশানুক্রমিক ভোগ দখলের 'ভুঁইহারি' জমি গ্রাস করে। এভাবে 'ভুঁইহারি' জমি হয়ে যায় বহিরাগত বড় জমির মালিকদের 'মাঝিহাস' জমি। আবার 'মাঝিহাস জমি' খাজনার বিনিময়ে মুণ্ডা কৃষকদের চাষাবাদে দেওয়া হয়। একে বলা হত 'রাজহাস জমি'। ক্রমে 'রাজহাস জমি'র খাজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জমিদারগণ চাষের কাজে বিনা মজুরিতে আদিবাসীদের দিয়ে খাটিয়ে নেয়। বাধ্যতামূলক এই শ্রমদানের নাম 'বেঠ-বেগারী'। এভাবে খাজনা বৃদ্ধি ও বেগারির চাপে মুণ্ডারা জমিহারা ও তাদের জীবনমান সংকটাপন্ন হয়। মূলত 'সর্দার লড়াই' বা 'মুল্কি লড়াই' ছিল এই ভূমিহারা বিক্ষুব্ধ আদিবাসী মুণ্ডাদের অসন্তোষ, আন্দোলন বা সংগ্রামের প্রতিফলন। স্বভাবত, ১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে 'মাঝিহাস জমি' কেড়ে নেওয়ার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। খ্রিষ্টান মুণ্ডারা জমিদারের লোকজনকে 'মাঝিহাস' জমি চাষে বাধার সৃষ্টি করে। পুলিশ জমিদারের সঙ্গে যোগাসাজসে বাধাদানকারী মুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে ও বিচারে তাদের কারাদণ্ড হয়। তথাপি তাদের আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। তামার পরগনার গ্রামে গ্রামে তা বিস্তার লাভ করে। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাগোষ্ঠির 'মুলকি লড়াই' থেকে শুরু করে বিরসা মুণ্ডার রাজনৈতিক ও নতুন ধর্মীয় মতবাদপুষ্ট আন্দোলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিরসার নেতৃত্বে উল্‌গুলান চলে ১৮৯৫-১৯০০ সাল পর্যন্ত।

মুণ্ডাদের কাছে জঙ্গল-পাহাড়-ঝর্ণা তাদের মা। বিরসা মুণ্ডা তাদের সমাজের সমস্ত প্রকার সংস্কার-পাপবোধ থেকে মুক্ত হয়ে ভিন্ন মানুষের পরিণত হয়—তার রক্তে জমতে থাকে 'প্রতিবাদ'। সে শুনতে পায় বৃহত্তম জীবনের হাতছানি। মূলত, 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী কার্য-কারণসূত্রে মুণ্ডা-বিদ্রোহের বিষয়টি পর্যায়ক্রমে গ্রন্থিত করেছেন। অর্থাৎ মুণ্ডা বিদ্রোহ বা আন্দোলনের উদ্ভব, মূল বৈশিষ্ট্য, প্রস্তুতিপর্ব, বিস্তার, পরিণত ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে একসূত্রে এক সরলরেখায় সজ্জিত।

বিরসা মুণ্ডার পিতা সুগানা মুণ্ডা ভিখারিরও অধম তথা হতদরিদ্র মানুষ। তার কপালে ও পেটে যেমন আগুন, তেমনি

মনেও। তথাপি সুগানা মুণ্ডার মধ্যে কোনো প্রতিবাদ নেই, যেহেতু সে দিকুদের কাছে 'বেঠবেগারি' করে না, 'সেবকপাট্টা' লিখে দিয়ে 'জন্মদাস' হতে চায় না, টাকার লোভে আড়কাঠিদের কাছে নিজেকে বিক্রিও করে না অর্থাৎ কোনোরকম ঝামেলায় যেতে সে নারাজ। কিন্তু পুত্র বিরসা তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। তার রক্তে মহাবিদ্রোহের ফুলকি ছড়িয়ে দিয়েছে ধানী মুণ্ডা, সমস্ত বন-জঙ্গল নাকি বিরসার। বৃদ্ধ ধানী মুণ্ডার লড়াই এর অনভিজ্ঞ নয়—প্রথম 'মুণ্ডা লড়াই', হুল, খেরোয়ার লড়াই, সর্দারদের মুলকি লড়াই' সর্বত্র লড়ে এসেছে। ধানী তার জীবদ্দশায় দশটি ছেলেকে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে, তাদের লড়াই সে নামিয়েছে। বর্তমান বিরসার মধ্যে সে খুঁজে পায় মুণ্ডাদের ভগবানকে তাই বিরসাই তার একমাত্র লক্ষ্য, সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের দেবতা, মুণ্ডাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচানোর তথা সুখ-দুঃখের জীবন্ত ভগবান। যত বন-পাহাড় আছে সবই বিরসার বলে ধানী তার মধ্যে অধিকারবোধের চেতনা জাগায়—ভবিষ্যতে বিরসাই হবে, 'উল্‌গুলান' বা মহাবিদ্রোহের নায়ক। এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ধানী মুণ্ডা বিরসাকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছে। বস্তুত, 'উল্‌গুলান' বা মহাবিদ্রোহের পটভূমি প্রস্তুত করতে এটাই তার প্রাথমিক ও অকৃত্রিক প্রচেষ্টা।

সাহেব সরকার আইন জারি করেছে পালামৌ-মানভূম-সিংভূমে। সকল ঘাস জমি ও জঙ্গলের কোন অধিকার নেই মুণ্ডাদের তারা অরণ্যের মধ্যে গাই-ছাগল চরাতে পারবে না, জঙ্গলের কাঠ-পাতা-মধু আহরণ করতে পারবে না, তাদের শিকার-খেলার কোনো অধিকার থাকবে না। সাহেব সরকার অরণ্যের ভেতর মুণ্ডাদের যত গ্রাম সবই চিরতরে উচ্ছেদ করে দিল—বিপরীতে মুণ্ডাদেরও আর্জির অধিকার ছিল না। বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডারা জঙ্গল-আপিসে আর্জি জানায়—'জঙ্গলের অধিকার দিতে হবে।'[৮]

এখানে বিরসা এক ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন মুণ্ডা, দুঃসাহসী-নির্ভীক, স্বজাতি ও স্বদেশ প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। জঙ্গল আপিসের বাবুদের লক্ষ্য করে বিরসার দ্রোহবাণী—'এই দিকু। আমার নাম বিরসা। আমি সাহেব, ডরাইনা।'[৯] বস্তুত, অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিরসার এই প্রতিবাদী ভূমিকা নিঃসন্দেহে 'উল্‌গুলান'-এর অঙ্কুরিত বীজ। চালকাড়ে বিরসার মা-বাবা উপবাসক্লিষ্ট, তাদের দারিদ্রের নগ্ন চেহারায় সে ভীষণ ক্ষুব্ধ-তার জেদ প্রতিজ্ঞা সে বাঁচবে, নয় মরবে। জঙ্গল-আপিসের নিয়ম-কানুন, আইন-শৃঙ্খলার বেড়াজাল কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে, জংলা-আইন অমান্যের সাজা জেল-জরিমানা ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে মুণ্ডাদের। বিরসা শুনতে পায় বৃহত্তর জীবনের ডাক, আপন দুঃখ-বঞ্চনার গভীরে সমগ্র মুণ্ডা সমাজের দুঃখ-বঞ্চনা-হাহাকার প্রতিধ্বনিত অর্থাৎ শুধু নিজের জন্য নয়, সকল মুণ্ডার দুঃখ ঘোচাতে হবে, সকলের শৃঙ্খল মোচন করতে হবে, অরণ্যের অধিকার কেড়ে নিতে হবে তার অনুভূতিতে একমাত্র অধিকার রক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অধিকার রক্ষার চেতনাই মহাবিদ্রোহের জন্ম দেয়, আর সেই বিদ্রোহের জন্মদাতা তো বিরসা। এ সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন—''ওর অরণ্য জননী কাঁদছে। অরণ্য ধর্ষিতা, দিকুদের হাতে, আইনের হাতে বন্দিনী। জননী অরণ্য বলেছিল, 'মোরে বাঁচা বিরসা। আমি শুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক হব।'[১০]

বিরসা তার অরণ্য জননীকে প্রতিশ্রুতি দেয়—সে তার অরণ্য জননীকে শুদ্ধ করবে, সে বলেছে, অরণ্য জননীকে যারা নগ্ন করেছে, প্রয়োজনে তাদের বিনাশ করতে সে প্রাণ দিতেও অকুণ্ঠিত—'আমি তোমারে রক্ত দিব।'[১১]

বিরসা মুণ্ডার জেদ, প্রতিজ্ঞা, দৃপ্ত পৌরুষ তেজ দেখে সমগ্র মুণ্ডা সমাজের বিশ্বাস জন্মে বিরসা তাদের ভগবান, সে দিকুদের তাড়াবে, তাদের জঙ্গল ফিরিয়ে দেবে, সে পারবে—তার জন্যই 'সকল রুক্ষা-ভুখা বাঁচবে, মরাকে জিয়াবে, ভূখাকে ভাত দিবে।' তাদের দৃঢ় বিশ্বাস সিংবোঙা ওরাওঁ-কোল-খারিয়া-মুণ্ডাদের রক্ষা করতে পারবে না, যীশুও না, তাদের একমাত্র নতুন ভগবান বিরসা পারবে, কারণ বিরসাকে তারা ভগবান বলে মনে করে।

বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডারা নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ। মুণ্ডারা নবজাগরণের সাথে এগিয়ে যায়, যুগ-যুগান্তরের ব্যথা-বেদনা-ক্ষোভ প্রশমিত করতে, লড়াইয়ের সামিল হতে, এক সুস্থির লক্ষ্যপূরণের দিকে। সমাজের উচ্চবর্গ তথাকথিত মহাজন-জমিদার-পাটোয়ারি-আড়কাঠির দল একেবারে তটস্থ—যদি মুণ্ডারা খাজনা-সুদ না দেয়, জমি বাঁধা রেখে ধান-গম ধার না নেয় বা চা-বাগানে কুলি হতে না যায় তাহলে সমূহ বিপদ। এভাবে তাদের শোষণের পথ বন্ধ হলে লোভ-রিপুও যে

প্রশমিত হবে না। খৃষ্টান মিশনারিরাও টের পায় মুণ্ডা জাগরণের। খৃষ্টান হওয়া তো দুর-অস্ত, মুণ্ডা সন্তানেরা মিশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এ কীসের ইঙ্গিত। চারিদিকে বারুদের গন্ধ, বিদ্রোহের সমারোহ। শোষক শ্রেণী সে গন্ধ পায়, তারা আঁতকে ওঠে। মুণ্ডারা চাষবাস ছেড়ে দিচ্ছে, চাষবাস থেকে বিরত থাকার সাহস পাচ্ছে কোথা থেকে এ নিশ্চয় বিদ্রোহের প্রাথমিক মহড়া, তারা নিঃসন্দেহে এগিয়ে যাচ্ছে মহাবিদ্রোহের প্রস্তুতির পথে। ১৮৯৫ সালের ৬ই আগস্ট বিরসা মুণ্ডার বলিষ্ঠ উচ্চারণ মুণ্ডাদের নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করার পক্ষে যথেষ্ট—'সরকার ''উৎগেজে'', খতম হয়ে গেছে। মুণ্ডারিরাজ এবার কায়েম হবে।'[১২]

স্বজাতীয় মুণ্ডা পুলিশদের বিরুদ্ধে বিরসার ঘৃণার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হলো—'তুমি মুণ্ডা নাই আর, তাই মুণ্ডাদের দুঃখ তোমার বুকে বাজে না। তুমিও দুশমন।'[১৩] বিরসা মুণ্ডাদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচাতে পারবে যা ভগবান পারে না, সে সিংবোঙা বা মিশনের যীশু খৃষ্টের চেয়েও শক্তিমান। এ ধারণা তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়সঞ্জাত। বিরসার সেই আত্মপ্রত্যয় উক্তি 'আমি ভগবান। মুণ্ডাদের ভগবান।'[১৪] বিরসা আর কারো নয়, কেবল মুণ্ডাদেরই ভগবান, 'সে 'ধরতি আবা', তার বিনাশ নেই, পুলিশদের হাতেও না। মূলত, লড়াই ছাড়া যে মুণ্ডাদের বাঁচার পথ নেই, তারা লড়াই না করলে কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না—এই চরম বস্তুগত সত্যটি বিরসার একান্ত সহজাত ও আত্মগত উপলব্ধি। বিরসার এই উপলব্ধ সত্য মুণ্ডারিদের মধ্যে সঞ্চারিত করে, তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়।

চালকাঁড় থেকে রাঁচি পর্যন্ত মুণ্ডা গ্রামগুলিতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ মুণ্ডাদের মুখে কোনও কথা নেই। তারা জমিদার-মহাজনদের কথা মানতে নারাজ। তারা খেতমজুর বা 'বেঠ-বেগারী'র কাজে ইস্তফা দিয়েছে। উপোস-অনাহারে তারা আদৌ ভীত নয়। মুণ্ডারা চাষবাসে যাচ্ছে না, ঋণ নিচ্ছে না, বা ভিক্ষাও করছে না দেখে জমিদার মহাজনরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। বিরসা যে মুণ্ডাদের খেপিয়ে তুলছে, জঙ্গলে তাদের অধিকার নিয়েও তাদের খাজনা বন্ধের বিষয় নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে—এ বিষয়ে কমিশনারের স্থির বিশ্বাস। বিরসাকে যখন প্রথমবার পুলিশ ধরতে আসে, তখন থেকেই মুণ্ডা জনরোষ বা বিক্ষোভ দানা বাঁধে। মুণ্ডাদের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হয় পর্যালোচনা কেন মুণ্ডারা সুবিচার থেকে বঞ্চিত, কেন তাদের খাজনার বৃদ্ধি ঘটে। দারোগা অন্যায় ভাবে বিরসাকে ধরতে আসে। ভগবান বিরসা বলেছে—'এমন সব চলতে পারে না।'[১৫] কমিশনারেরও স্থির বিশ্বাস জন্মে যে, মুণ্ডদের একমাত্র লক্ষ 'বিদ্রোহ'—যে কারণে মুণ্ডাদের যে কোনো জমায়েত বা বিদ্রোহী আলোচনা তিনি বন্ধ করতে চেয়েছেন। বিরসা বৃটিশ সরকার কমিশনারের দম্ভ ভেঙ্গে চুরমার করতে বদ্ধপরিকর—অন্যদিকে সরকারের উদ্দেশ্য এই অন্ত্যজবর্গের 'বর্বর অসভ্য' মুণ্ডাদের সামনে বিরসার মুখোশ খুলে দেওয়া, বিরসা যে 'ভগবান' নয়, 'প্রফেট' নয়, তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া। এই লক্ষ্য পূরণে ১৮৯৫-এর ৬ আগস্ট মাসে বিরসাকে গ্রেফতার করার জন্য হেড কনেস্টবলকে আরো দুজন কনস্টেবল দিয়ে পাঠিয়ে দিল দারোগা সাহেব। কিন্তু বিরসাকে গ্রেফতার করা গেল না। এবার এলেন রাঁচির পুলিশের ডেপুটি সুপার মী-আর্স। সঙ্গে মুরহু মিশনের রেভারেণ্ড লাস্‌টি, বন্দগাঁওয়ের জমিদার জগমোহন সিং আর বন্দুকধারী বিশাল পুলিশকাহিনী। চালকার গ্রাম ঘিরে পুলিশ বেয়নেট উঁচিয়ে এগিয়ে এল। পুলিশ বিরসাকে সহজে ধরে ফেলল।

বস্তুত, বিরসার বিচার বা শাস্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তি দেখানো হয়। মী-আর্স সাহেব ডেপুটি কমিশনারকে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, সর্দারদের হারানো জমি ফিরে পাবার যে 'মুলুক্‌ই লড়াই' তার সঙ্গে বিরসার আন্দোলনের কোনো প্রভেদ নেই। মুণ্ডা সর্দার এবং বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা একযোগে বিরসার আন্দোলনে সামিল হয়ে বিদ্রোহকে আরো শক্তিশালী করে তুলেছে। লক্ষণীয়, অরণ্যের অধিকার, মুণ্ডাদের খেপিয়ে তোলা, মুণ্ডাদের খাজনা বন্ধের ডাক, নিজেকে ভগবান বলে মুণ্ডাদের কাছে বিরসার শ্রদ্ধা আদায়জনিত অপরাধে যেমন গ্রেপ্তার করা হয়, তেমনি একই অপরাধে তার বিচারের সিদ্ধান্ত হয়। বিরসা মুণ্ডাদের বিদ্রোহের প্ররোচক এবং বিক্ষোভের স্রষ্টা—এই অপরাধে ১৮৯৫ সালের ১৯শে নভেম্বর বিচারে বিরসা দু-বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। তারপর মুণ্ডারা আবার দলে দলে ক্রীশ্চান হতে শুরু করল। ধানী মুণ্ডা ভাবে দুবছর তো ওরা বাঁচুক, তারপর দেখা যাবে। সালী পেট কাপড়ে করে তীর যোগান দেয় ধানীকে। সবাই জানে সালী

সন্তানসম্ভবা। ১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে বিরসা মুক্তি পেল। মুণ্ডা গ্রামে মাদল বাজল, মেয়ে-পুরুষে নাচল, ক্রীশ্চান হওয়া মুণ্ডারা গীর্জা ছাড়ল, তাদের ভগবান এসে গেছে। বিরসা তার ভক্তদের আবার উল্‌গুলান' এর দীক্ষা দিল।

দু-বছর কারাবাস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিরসা আরো প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ডোমবারি পাহাড়ের নিচে জাগরী মুণ্ডার বাড়ীতে বিরসাইতরা প্রথম সভা করে। বিরসা মুণ্ডাদের জানিয়ে দেয়, জমিদার-জোতদার-মহাজনরা তাদের ক্ষেত-খামার বলপূর্বক অধিকার করেছে, এরা প্রতারক আমাদের শত্রু। ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের হাতে তাদের 'খুটকাট্টি গ্রামগুলো' তুলে দিয়েছে। সুতরাং ইংরেজ সরকার তাদের দুশমন। এই শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া তাদের বাঁচার পথ রুদ্ধ। বিরসা মুণ্ডাসমাজের মানুষদের এ পথেই পরিচালিত করতে এক সুদৃঢ় সংকল্পে সুস্থির। বিরসা ঘোষণা করে,

> ''দুশমন সবাই। সকলের সাথে মোদের লড়াই হে। এমন লড়াই মুণ্ডা কখনো লড়ে নাই। সকল দিকুদের সঙ্গে লড়াই, লড়াই সরকারের সঙ্গে।''[১৬]

একে একে সিম্‌বুয়া পাহাড়, ডোমবারি পাহাড়ে সভা হয়ে গেল। সেখানে বিরসা তার বিদ্রোহের বিবরণ দিয়ে দিল। পুলিশ চিরুনি তল্লাসী করেও তাদের ধরতে পারলো না। বিরসাইতরা বিদ্রোহের গান গাইল—'বাঁচার চেয়ে মৃত্যু ভাল?' অবাক হয় বিরসা! পরে বুঝতে পারে সময় তাদের এই গান শিখিয়েছে। একদিকে বিদ্রোহ অন্যদিকে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা।

আইনের প্যাঁচে ফেলে মুণ্ডাদের শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এর সুবিধা অনেক, বিচারের সময় কেউ কারো ভাষা বোঝেনা। গ্রেপ্তার করে, কয়েদ করে রেখে, অনন্তকাল ধরে তদন্ত চালান যায়।

মহাশ্বেতার স্বকীয় ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, বিশ্বাসময় অনুধ্যান যা বিরসার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র আন্দোলনই বিপ্লবের পথ। সমগ্র মুণ্ডাজাতির ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত ব্রিটিশ রাজশক্তির হাত থেকে তাদের মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। বিরসাও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুণ্ডা জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে।

১৮৯৯ সালে বিরসা ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামের সূচনা করে। এর প্রাক্-পর্বের সর্দারদের 'মুলুক-ই-লড়াই', মুণ্ডাদের নানান দাবি ও অধিকারের প্রশ্ন উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য বিষয়—যা মহাশ্বেতা নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন, উপন্যাসের নায়ক বিরসা তার অন্তরের এক মহাশক্তি সর্দারদের দুর্বল আন্দোলনকে মহাশক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত করে। সে মুখে ধর্মীয় আন্দোলনের কথা বলে মুণ্ডাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেও তার 'উল্‌গুলান' রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবহমানতা নিয়েই প্রকাশ পায় এবং ব্রিটিশ সরকারকে যে নানাভাবে বিব্রত করে তা বলাই বাহুল্য। বিরসার অন্তরদর্শনে সহজেই ধরা পড়ে মুণ্ডাদের খুটকাট্টি গ্রামের দখলদার ঐ জমিদার এবং ব্রিটিশ সরকার। মূলত, মুণ্ডারাই তাদের জমির প্রকৃত মালিক সুতরাং আগে অ-আদিবাসীদেরই উৎখাত বা উচ্ছেদ করতে হবে। বিরসা ছোটনাগপুরের অজস্র পথ-অরণ্য-পাহাড় হেঁটে সভার পর সভা করে বেড়িয়েছে। ১৮৯৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাঁচি থেকে চাইবাসার কত স্থানে যে সে গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুত, উপন্যাসে বর্ণিত ১৮৯৯-এ বিরসার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা এবং ৯ই জানুয়ারি, ১৯০০ সালে শৈলরাকাব পাহাড়ে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের সঙ্গে সশস্ত্র ইংরেজ বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ঘটনা এক ঐতিহাসিক দলিল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের সমস্ত সমুণ্ডাসমাজ 'বিরসাইত ধর্ম' এ দীক্ষিত। সমস্ত বিরসাইতরা একতাবদ্ধ হয়ে বিরসার নেতৃত্বে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে 'মহাবিদ্রোহ' সূচনা করে। এবার বিদ্রোহী মুণ্ডারা কারো হুকুম মেনে চলবে না। তারা ডোমবারি পাহাড়ের নিচে জাগরী মুণ্ডার বাড়িতে ফেব্রুয়ারির প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে প্রথম গোপন সভা করে। তারা এতকাল শান্তির পথে লড়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি, তারা ভগবান বিরসার নেতৃত্বে লড়াই করতে প্রস্তুত। 'উল্‌গুলান' এই তাদের একমাত্র পথ, সে পথে তাদের জয় অনিবার্য একথা তারা মনে করে। তাদের ভগবানের রাজ প্রতিষ্ঠিত হলে দিকুরা 'সেবকপাট্টা' লিখিয়ে নিতে পারবে না, তারা মুণ্ডাদের 'জন্মদাস' এ রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না, তাদের নিয়ে যাবে না বলপূর্বক 'বেঠবেগারী' দিতে। হোলির রাতে মুণ্ডারা তাদের দুই বীর দুখন সাই ও রোতন সাইয়ের নামে রচিত গান এবং কোলবিদ্রোহের গান গেয়ে অনুপ্রাণিত হয়। সিমবুয়া পাহাড়ের

উপর তিনশ মুণ্ডা তীর ধনুক নিয়ে উপস্থিত হয়। হোলির রাতে উৎসবে আগুন জ্বালিয়ে তারা বিদ্রোহের গান করে তাহলো—

"দুন্‌দিগারার দুখন সাই কারেও ডরে না হে
রামগারার রোতন সাই কারেও ডরে না হে।"[১৭]

মুণ্ডারা সিমবুয়া পাহাড়ে মহাবিদ্রোহের শপথ নিয়ে 'কোল বিদ্রোহের গান' গেয়ে নিজেদের প্রতিবাদী ভূমিকায় উজ্জীবিত করে—

"খুদা পিঁপড়া যেমন যায়, তেমন সার বেঁধে
কাঁধে হাতিয়ার নিয়ে ওরা কোথায় যায়?
কোথায় তীর ছোঁড়ে
বড় পিঁপড়ার মত সার বেঁধে, হাতিয়ার কাঁধে?
আগো; ওরা লড়ে বুন্দুতে
আগো! ওরা তীর ছোঁড়ে তামারে যেয়ে।।"[১৮]

গানের শেষে বিরসার বিদ্রোহীবাণী নির্ঘোষিত, হোলিতে 'ইংরাজ রাণীর প্রতিমা' কলাগাছটা সে কাটতে বদ্ধপরিকর, তার বিশেষ অর্থ মন্দোদরীর মাথা কেটে রাবণরাজ খতম করা। জগাই মুণ্ডা অত্যাচারী শোষক ও ব্রিটিশ রাজের প্রতীক কলাগাছটা কাটে। শেষে বিরসা বলে ওঠে—"অমন করে রাজাদের আর হাকিমদের কাটতে হবে।"[১৯]

পুলিশ জঙ্গল আর পাহাড়ে চিরুনি তল্লাশি করেও বিরসাকে খুঁজে পায়না। মুণ্ডারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারাও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে জঙ্গল-পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। সব জায়গায় বিরসার শরীরী উপস্থিতি নেই, তথাপি বিরসাকে নিয়ে তারা এক বিশ্বাসের জগতে বিচরণ করে, বিরসাকে নিয়েই তাদের কণ্ঠে বিশ্বাস, প্রতিবাদ-শোষণ ও বিদ্রোহের গান—

"বিরসা ভগবান ডাকল, ও ভাই চল যাই
চুটিয়া মন্দিরে
সে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে বলল
চল যাই জগন্নাথপুরের মন্দিরে
আমরা গেলাম, তিন রাত থাকলাম
দেবতাকে জানালাম প্রণাম
ছুটিয়া উঠল কেঁপে
রাঁচি আর ডুরাণ্ডা দেখ, কাঁপছে।।"[২০]

বিরসা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে সভা করেছে এবং আন্দোলনের পরিকল্পনা করেছে। ইংরেজরা তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার জন্য যখন খুঁজে বেড়ায়, তখন সে নানান পরিকল্পনা ও বুদ্ধির কৌশলে অরণ্যের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে চলছে। রাঁচি-সিংভূমের পুলিশ, সিংভূমের ডি.এস.পি এবং মী-আর্স সাহেব মৃত্যুঞ্জয় দারোগাকে নিয়ে বিরসাকে খুঁজে বের করতে তৎপর—যেহেতু সে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে মুণ্ডা সমাজের মধ্যে। সে সংযত জীবন-যাপন করবে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের খেপিয়ে তুলবে না—এই শিকার উক্তি দিয়ে বিরসা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু মুক্তি লাভের পর সে কথা রাখেনি।

বিরসা বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে উদ্ধত হয়েছে। সে আশ্রয় নিতে চলে এলো নওরতনগড়ের অতি বিখ্যাত পবিত্র বন সরনায়, বিরসার সঙ্গী তথা পার্শ্বচর যোদ্ধা নানকরা এলো, যুবতীরা, প্রচারকরা, বৃদ্ধা এবং সবার শেষে পুরাণকরা। জারিয়া গ্রামের মোড়ল বা সর্দার ভগবান বিরসার উল্‌গুলানের নেতৃত্বে খুশি। উল্‌গুলানের কাজে 'পহান-দেওঁরা' রাও

সামিল হতে চায়—কারণ 'মুণ্ডারাজ' ফিরে এলে তাদেরও ঘরে সুখ-শান্তি ফিরে আসবে। প্রকৃতপক্ষে বিরসা মুণ্ডাদের ভগবান হয়ে যে সমাজধর্মের পরিবর্তন বা বিপ্লব নিয়ে আসবে তা নতুন 'মানবধর্ম' প্রতিষ্ঠার মহাবিপ্লব। এই মানবধর্মে বিরাজ করবে কেবল মুণ্ডাদের চিরন্তন 'আদিম সরলতা, ন্যায়বোধ, সাম্যনীতি।' বিশেষত, সেখানে থাকবে না ভিন্ন আদিবাসীদের কাছ থেকে ধার করা 'করমপূজা' বা অন্যান্য প্রথাসমূহ, অতি প্রাচীন 'অসুর' ধর্মের জাদুপ্রক্রিয়া 'রক্তোৎসব' ইত্যাদি। বিরসা নস্যাৎ করেছে মুণ্ডাদের রক্তে মিশে থাকা পচনশীল অবান্তর-অবাস্তব ধ্যান-ধারণা ও সংস্কারসমূহ যেমন, অসুর পূজা, দেওঁরা-পহানের অলৌকিক ক্ষমতার বিশ্বাস, সহস্র সংস্কার বন্ধন।

বিরসার একমাত্র লক্ষ্য আদিমযুগের অরণ্যের অধিকার খুটকাট্টি গ্রামব্যবস্থা ছিনিয়ে নেওয়া আর তাদের সামনে জমিদার-মহাজন-বেনে-আড়কাঠি-সাহেব প্রমুখ শোষকের ঘৃণ্য প্রাচীর ধ্বংস করা। বস্তুত, একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সম্ভব একথা বিরসা স্পষ্টত উপলব্ধি করে এবং সমগ্র মুণ্ডা জাতিকে এই বৈপ্লবিক চেতনায় উজ্জীবিত করে। বিরসা ডোমবারি পাহাড়ের উপর মুণ্ডাদের সমাবেশে দিকুদের জুলুমবাজির প্রতীক লাল নিশান কেটে দেয়, সূচনা করে উল্‌গুলানের আর সাদা নিশান উড়িয়ে সংকেত জানায় তাদের অব্যর্থ জয়ের। বিরসা সমাবেশে উপস্থিত মুণ্ডাদের আশ্বস্ত করে—সে গয়া মুণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে মুণ্ডাদের বসতি এলাকায় সর্বত্র গিয়ে মন্ত্রের ন্যায় 'উল্‌গুলান, উল্‌গুলান, উল্‌গুলান' উচ্চারণ করবে, উল্‌গুলান চলবে রাঁচি-চাইবাসায়। পৌষমাসের দশ তারিখ সাহেবদের বড়দিন, সেদিন থেকে শুরু হবে উল্‌গুলান, বিদ্রোহের গান। বিরসাকে নিয়ে যে-গান তারা গায় সেই গানের মধ্যে উল্‌গুলানের প্রেরণা তথা মৃতসঞ্জীবনীর স্বাদ পায়। সে গানে প্রকাশ পায় তাদের বাঁচার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়, সেই মৃত্যুকে আহ্বানের মধ্যে তারা খুঁজে পায় বিরসা এবং উল্‌গুলানের অমরত্ব ও সার্থকতা—"বিরসার মরণ নাই। উল্‌গুলানের শেষ নাই।" [২১]

বিরসা সমগ্র মুণ্ডাদের সমাজের মধ্যে মহাবিদ্রোহের চেতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। তাদের জমি থেকে জবর দখলদার ব্রিটিশ সরকারদের উৎখাত করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত, মুণ্ডারাই জমির প্রকৃত মালিক। বিরসা মুণ্ডাদের মনে এ আস্থা ফিরিয়ে আনতে বিশেষভাবে তৎপর। অর্থনীতি কিংবা ধর্মীয় দিক থেকে যারা মুণ্ডা জাতির শত্রু তাদের নির্মূল করার শপথই বিরসার লড়াইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

মহাশ্বেতা উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন, ১৮৯৯ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে রাঁচি-চাইবাসার বহু স্থানে মহাবিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে যায়, মুণ্ডাদের বিশ্বাস এক সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ। নৃত্য-গীত-উৎসবে মত্ত হয়ে দিন কাটাবার সময় আর নেই—এ বিশ্বাস বা নয়া ধ্যান-ধারণা মুণ্ডাদের কাছে শ্রেয়, এটাই তাদের একমাত্র চলার পথ। বিরসা তাদের ভগবান—সে যে পথের সন্ধান দিয়েছে, সে পথই মুণ্ডাদের একমাত্র অনুসরণীয়। মুণ্ডাদের কাছে বিরসার নির্দেশ—

"আর নাচ-গান-করম-হোলি-সোহরাই পরবে মাতামাতি নয়।
মাথায় ফুল-চুলে ফুল-হাঁড়িয়া তাড়ির মাতন আর নয়।
সব ভুলে এক মন, এক লক্ষ্য হও।" [২২]

বস্তুত, বিরসার এই চেতনা সম্পূর্ণ আবেগবর্জিত, জীবনের চরম বস্তুগত সত্যের অনুসারি—যা মুণ্ডারা মনে-প্রাণে মেনে নেয়।

মহাশ্বেতা উপন্যাসে মুণ্ডা জীবনের এক চরম মুহূর্তের উল্লেখ করেছেন এবং এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাও বটে। ১৮৯৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বিরসা মুণ্ডাদের জানিয়ে দেয় পরিকল্পনার কথা—প্রথম অধ্যায়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ও তীর ছুঁড়ে ক্রিশ্চানদের মনে আতঙ্ক বিস্তার এবং দ্বিতীয় পর্বে সশস্ত্র সংগ্রাম। ২৪শে ডিসেম্বর 'ক্রিস্‌মাস ঈভ'। সেদিন উৎসব সন্ধ্যায় ইওরোপিয়ান ক্লাবগুলো সুরাপানে মত্ত, সুযোগ বুঝেবিরসাইতরা শুরু করে তীর ছোঁড়া, বেধে যায় গণ্ডগোল ও ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। রাঁচি-সিংভুম-চক্রধরপুরের সর্বত্র চলছে অগ্নিকাণ্ড ও তীর ছোঁড়া মহাতাণ্ডব। আক্রান্ত হয়েছে তামার থানার ক্রিশ্চানরা, তোরপাতেও ক্রিশ্চানরা, জার্মান চার্চগুলো এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে খুনটি থানার বহু গ্রামে। রেভারেণ্ড লাস্‌টি, রেভারেণ্ড হফম্যান, রেভারেণ্ড ক্যারব্যরিকে লক্ষ্য করে মুণ্ডারা তীর ছোঁড়ে। কুন্দ্রুগুটুর

জার্মান মিশন চার্চ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। লাগরাতে একজন কনস্টেবল, চক্রধরপুরের জার্মান চার্চের একজন চৌকিদার, এবং সোমপুরের একজন জার্মান ব্যবসায়ী নিহত হয়। মূলত, এ ধরণের ঘটনা থেকে জমিদার ও ইংরেজ সরকার মুণ্ডা বিদ্রোহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তা দমনে তৎপর হন। ভবিষ্যতে যাতে বিক্ষোভের দানা না বাঁধে বা বিক্ষোভ দমন করতে সর্বত্র বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হয়। কোল বিদ্রোহ দমন নয়, বিরসাকে পুনরায় গ্রেপ্তারের তোড়জোড় শুরু হল। মূলত, বিদ্রোহের ব্যাপকতায় ডেপুটি পুলিশ সুপার মী-আর্স, ডি.সি, স্টিটফিল্ড ও ক্যাপ্টেন রোশ প্রভৃতি প্রশাসকগণ ভয়ে তটস্থ। তবে মুণ্ডাদের আক্রমণাত্মক ও অগ্নিসংযোগমূলক ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরকার এক স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মুণ্ডাদের এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপকে কখনো প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও জোটবদ্ধ বিরোধিতা বলা যায় না। এ হলো ক্রিশ্চান মিশনারি ও সাহেবদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বিরসার আহ্বানে সমগ্র মুণ্ডা জাতির মধ্যে ১৮৯৯ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে বিদ্রোহী মুণ্ডাদের দমনে সরকার তৎপর। মুণ্ডারাও অধিকতর ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তারা ইংরেজ সাহেবদের তীরবিদ্ধ করে মারতে লাগল নির্মমভাবে, আর নিজেদের বাঁচাতে অরণ্য গহনে আশ্রয় নিল। বিরসার বিদ্রোহবাণী সাহেব, সাদা চামড়ার সাহেব ও সরকারের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, উল্‌গুলান সহজে থামবে না, কেউ থামাতেও পারবে না। কিন্তু বিরসা জানে, সরকার ছোটনাগপুরের অধিকার মুণ্ডাদের হাতে সহজে ছেড়ে দেবেন না। প্রথমে গয়া মুণ্ডা ষাটজন বিরসাইত নিয়ে ষাট দিকে উল্‌গুলানের প্রচারের দায়িত্ব নেয়। তাজনা নদীর তীরে তাঁবু ফেলেছে হেড্ কনস্টেবল। গয়া মুণ্ডার নির্দেশে মুণ্ডারা ভয়ঙ্কর বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে কনস্টেবলদের উপর। তাদের আক্রমণে দুজন কনস্টেবল জয়রাম ও বুধু নিহত হল। ডি.সি. মুণ্ডাদের ডেকে তাদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন, কিন্তু মুণ্ডারা ডি.সি-এর কথায় কর্ণপাত তো করলই না, তার পরিবর্তে তারা শুরু করে চরম বিদ্রোহ। তাঁরা সাব-ইন্সপেক্টর ইল্‌তাফ হুসেনকে কুড়োল ছুঁড়ে হত্যার চেষ্টা করে। বাধ্য হয়ে ডি.সি. গয়া মুণ্ডার উপর গুলি চালান এবং তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেন। মুণ্ডারাও লাঠি-টাঙি -দাউলি তরোয়াল নিয়ে সরকারি পুলিশের বিরুদ্ধে দু'ঘণ্টা ব্যাপী তুমুল লড়াই চালায়। সঙিনের খোঁচায় ক্ষত-বিক্ষত গয়া মুণ্ডা ও তার পরিবারের সকলেই। ডি.সি. গয়া মুণ্ডার কাঁধে গুলিবিদ্ধ করেন। গয়ার স্ত্রী মাকি ডি. সি. এর মাথায় লাঠির আঘাত করে। বিপরীতে উন্মত্ত পুলিশবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়ে-বালকদের উপর। অবশেষে মুণ্ডা ছেলে-বৌ-মেয়ের দল পুলিশের হাতে বন্দী হয়। এভাবে মুণ্ডারা পুলিশের অন্যায়-অবিচারে-শিকার হল। একমাত্র ব্যারিস্টার জেকব সাহেবই মুণ্ডাদের সপক্ষে। তিনি ডি.সি.-র অন্যায় ভাবে গুলি ছোঁড়া সমর্থন করেননি। তিনি গয়া মুণ্ডাকে গুলি করার পশ্চাতে যথার্থ কারণ বা সত্যান্বেষণে প্রয়াসী হন। কিন্তু ডি.সি.-কে সমর্থন করেন বাংলা প্রদেশের শাসক লেফটেনান্ট গভর্ণর ছোটলাট—যে কারণেই ব্যর্থ হল জেকবের সত্যান্বেষণের প্রচেষ্টা।

তারপর বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। তারা ব্রিটিশ সরকারের থানা, অফিস-আদালতে জেলা থেকে জেলায় বিক্ষোভ দেখায়। তীর-ধনুক-ঢাল-তরোয়াল-বলোয়া-বর্শায় সুসজ্জিত বিরসাইতরা 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে মিছিল করে অগ্রসর হয়। তাদের নেতৃত্বে ডোন্‌কা ও মাঝিয়া মুণ্ডা জীবনকে মৃত্যুর মুখে পতিত করে সামনের দিকে অগ্রসর হন। মিছিলে সকল মুণ্ডাদের গলায় বিরসার প্রশস্তি সূচক বিদ্রোহের গান ভেসে ওঠে—

"জিলিবা জিলিবা
জোলোবো জেলোবা
পানতিয়াকানালে বিরসা হো!
তিরোদা সেন্‌দেরা
লেংগা তিরিয়া
জোম তিরেসার
পানতিয়াকানালে বিরসা হো।"[২৩]

বিরসার নেতৃত্বে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মুণ্ডাদের আক্রমণ স্থল থানা—যেহেতু থানার কনস্টেবল-পুলিশ-দারোগা তাদের উপর সব রকমের হেনস্থা ও নির্যাতন চালায়। সুতরাং বিক্ষুব্ধ বিরসাইতরা প্রথমে খুন্টি থানা আক্রমণ করে। পথে কনস্টেবল বঘুনিরামকে হত্যা করে ডোন্‌কা ও মাঝিয়া মুণ্ডা। শেষে খুন্টি থানায় তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। থানায় রক্ষিত প্রচুর টাকা তারা স্পর্শও করেনি, তারা গ্রামের বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালায়নি। বাস্তবিকই তাদের এই সংযম নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মুণ্ডারা সূর্যের দিকে হাতিয়ার উঁচিয়ে উল্লাস করে। আসলে এটা হলো তাদের জয়ের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত, গণবিদ্রোহের মাত্রা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, উল্‌গুলানের মহা ব্যাপ্তি যেভাবে দুর্দমনীয় ও নির্মমরূপে দেখা দিচ্ছে তাতে ইংরেজ সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত। ১৯০০ সালের ১২ জানুয়ারি বড়লাটের টেলিবার্তাই তার প্রকৃত প্রমাণ। বড়লাট 'সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া'-কে বার্তা পাঠালেন—'গণবিদ্রোহ ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে।''[২৪]

লক্ষণীয়, একের পর এক দলে দলে বিরসাইতরা শৈলরাকাব পাহাড় ও তার চারদিকের জঙ্গল পাহাড়ে জমায়েত হচ্ছে। শৈলরাকাবের চারিদিকে পাহাড়, জিউরার জঙ্গল—এই নির্জন এলাকা বিদ্রোহীদের আস্তানা 'গ্রাম-জঙ্গল' হিসাবে চিহ্নিত। ইংরেজ সরকারের চোখে বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী মুণ্ডারা বিদ্রোহী, তারা দেশদ্রোহী। সুতরাং বিদ্রোহীদের দমন উদ্দেশ্যে একসঙ্গে দল বেঁধে ছুটে আসেন কমিশনার-ডি.সি. পুলিশ, আর্মি-কর্নেল-ক্যাপ্টেন প্রভৃতি ইংরেজ সরকারের ফৌজ তথা বিদ্রোহ দমন শক্তিবাহিনী। সমস্ত পুলিশবাহিনী শৈলরাকাব পাহাড় ঘিরে ফেলে। বিরসার কথায় মুণ্ডারা, মরিয়া, তারা লড়াই করতে এসেছে কেবল জেতার জন্যই, পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ফিরে যেতে নয়। বিরসা জানে তাদের কুচিলা তীরের চেয়ে বন্দুকের গুলির ক্ষমতা মারাত্মক, আবার উন্নতমানের হাতিয়ার নিয়েও সব সময় জেতা যায় না। অবশ্য এও ঠিক, বিগত বিদ্রোহের ইতিহাসগুলো আদিবাসীদের জীবনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। তাদের সহ্য করতে হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি, যেমন—সাঁওতালরা তাদের 'হুল বিদ্রোহে' জয় লাভ করতে পারেনি। কোলরাও সাতান্ন বছর পূর্বের বিদ্রোহে জয়ী হতে পারেনি এবং খেরোয়াররাও জয়ী হতে পারেনি। বিরসার বদ্ধমূল বিশ্বাস সাঁওতাল-কোল-খেরোয়ার সর্দাররা মরেনি, তারা হেরে যায়নি। বিদ্রোহের মধ্যেই তাদের জীবনী সত্ত্বা বেঁচে আছে। যেহেতু বিজেতারা ইতিহাসের পাতায় ঢুকে পড়েছে, তাদের নাম মানুষের রক্তে, বঞ্চনা-ক্ষুধায়, দরিদ্র ও শোষণে মিশে গেছে চিরতরে—তারা এভাবে বেঁচে গেছে, অমরত্ব লাভ করেছে।

বিরসা মুণ্ডা বিরসাইতদের নিয়ে জিউরার জঙ্গলে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। ১৮৯৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে শৈলারাকাবে হাজার হাজার বিরসাইত জমায়েত হয়। সরকার বাহিনীও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করে। উভয়পক্ষ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। ইংরেজ পুলিশবাহিনী বন্দুক-বেয়নেট নিয়ে সুসজ্জিত থাকে। স্ট্রিটফিল্ড দো-ভাষীর সহায়তায় মুণ্ডা সর্দারদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। কিন্তু প্রতিবাদী মুণ্ডারা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সমস্বরে তাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জন তোলে। নরসিংহ মুণ্ডা এগিয়ে আসে, তার দ্রোহবাণী তথা প্রতিবাদের ভাষা যেন সেই গর্জন ধ্বনি ছাপিয়ে দেয়,

> ''রাজটা কাদের? সাহেবদের? মোদের রাজ। মোরা তাদের দেশে গিয়াছি রাজ করতে, না তারা এসেছে হেথা? তবে হাতিয়ারটা কে দিবে? মোরা? সাহেবরা হাতিয়ার নামায়ে চলা যাও। মোরা হাতিয়ার দিব বলে হেথা এসাছি? রাজ নিব বলে এসাছি।''[২৫]

ক্যাপ্টেন রোশ ও কমিশনার ফর্বস সিপাইদের নিয়ে শৈলরাকাব পাহাড়টা ঘিরে ফেলেন এবং পশ্চিমের তিরিলকুটি বুরু থেকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন। কিন্তু প্রথমে সেই গুলি কোনো মুণ্ডার দেহ বিদ্ধ করে না। পুনরায় ক্যাপ্টেন রোশের নির্দেশে সিপাই ও সৈন্যরা গুলি ছোঁড়ে, এবার কিন্তু মুণ্ডারা আহত হয়, তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় পাহাড়ের কালো পাথর।

তারপর পুলিশ কমিশনার ফর্বসের নির্দেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনী মুণ্ডাদের বিরুদ্ধে গুলি ছোঁড়া বন্ধ করে চারদিক থেকে পাহাড়ের উপর উঠতে শুরু করে। আবার ফর্বস, রোশ ও স্ট্রিটফিল্ডের নির্দেশে মুণ্ডা নারী-পুরুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। ১৯০০ সালের ২৫শে মার্চ 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় প্রকাশ অন্তত চারশো বিরসাইতকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 'বেঙ্গল পুলিশ-ইনটেলিজেন্স' এ প্রকাশ এই যুদ্ধে মুণ্ডাসর্দারদের মধ্যে সাতশো মুণ্ডার প্রাণ বিয়োগ হয়েছিল।

হফ্‌ম্যানের মতে কুড়িজন ও সর্বোপরি সরকারের বিবৃতি শৈলরাকাবে দশজন মুণ্ডা নিহত ও সাতজন আহত হয়েছে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম কিংবা নানা বিবৃতির মধ্যে নিহত ও আহতের সংখ্যার পার্থক্য থাকলেও একটি চরম সত্য সহজেই অনুমেয়—এই আদিবাসী মুণ্ডারা জীবনের জন্য, বাঁচার তাগিদে, অধিকার খর্ব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে, পুনরায় তাদের খুটিকাট্টি গ্রাম ও অরণ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মারণযজ্ঞে ঝাঁপ দিতে এসেছে। তারা গুলির ভয়ে পশ্চাদপর হয়নি, বরং রীতিমত মনের সাহস নিয়ে তারা লড়াই করে এগিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় আর একটা ইতিহাস জন্ম নিক, মুণ্ডাদের রক্তে লেখা থাক শোষণ বঞ্চনার কাহিনী—যদি বা তাদের পরাজয় ঘটে তথাপি কোনো ক্ষতি নেই—জয়ের শপথ নিয়ে আগামী প্রজন্মের মর্মভূমিতে উপ্ত হোক লড়াই বা সংগ্রামের বীজ। তাই বিরসার এ লড়াই যে ইংরেজ ও দিকুদের নির্মূল করে মুণ্ডাদের 'মুক্তি' বা 'স্বাধীনরাজ' প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্তের লড়াই তা মুণ্ডাদের অস্তিত্বে সঞ্চারিত। বিরসার ভগবান হওয়ার নেপথ্যে এই চেতনা যে সক্রিয় তা উপন্যাসের কাহিনীর আঙ্গিকে, প্রতিটি ছত্রে ছত্রে মহাশ্বেতা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

বস্তুত, ইংরেজ সরকারের কাছে মুণ্ডাদের এই আন্দোলন রাজদ্রোহিতারই নামান্তর। সুতরাং ভবিষ্যতে মুণ্ডাদের রাজদ্রোহিতা দমনের উদ্দেশ্যে কিছু পরিকল্পনা গৃহীত হয় যেমন, প্রয়োজনে বিরসাইতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, মেয়েদের গ্রামবন্দী রাখা, সশস্ত্র বিরসাইতদের ধরার লক্ষ্যে অন্য বিরসাইতদের বন্দী রাখা, ভবিষ্যতে বিরসা ও তার দলকে আশ্রয় না দেওয়ার জন্য মান্‌কিদের মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে বিক্ষোভকারীদের দল ভেঙ্গে দেওয়া, দাঙ্গাজনিত অপরাধের শাস্তি হিসাবে দাঙ্গাকারীদের বন্দী করে কঠোর শাস্তি প্রদান, পুলিশ বা অন্য কোনো ইংরেজকে হত্যা বা হত্যার চেষ্টা করলে সেইসব অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করা, মুণ্ডাদের গ্রামে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন ইত্যাদি। বিশেষত, বিরসাইতরা সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই দিয়েছে তা একেবারে অন্যায় রাজদ্রোহ যে কারণে সরকার বাহাদুর এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বিরসা ও তার মুখ্য অনুচরদের বন্দীর উদ্দেশ্যে জরুরী গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। বস্তুত, বিরসাইত গ্রাম তন্ন তন্ন করে খোঁজার নির্দেশ যেখানে বিরসা অথবা বিরসাইতদের দেখা মিলবে সেখানেই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। কেউ বাধা দিলে তাকে মারা হবে গুলিবিদ্ধ করে। সিংভূম-রাঁচি, বন্দগাঁও-খুন্‌টি প্রভৃতি স্থানে সরকারি সৈন্য প্রেরিত হয়। কমিশনার ফর্বস্‌ বিরসা ও তার অনুচরবর্গকে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারি সহায়ক সংবাদের বিনিময়ে ইংরেজ সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। যে, বিরসার খবর দিতে পারবে তাকে পাঁচশ টাকা এবং অন্য বিরসাইতদের খবর দিতে পারলে একশ টাকা দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বিরসাইতদের ধরপাকড় শুরু করে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়।

ইংরেজ সরকারের এই গ্রেপ্তার পরায়নের কথা বিরসা জানতে পারে, সেও স্থির করে এটা জয়-পরাজয়ের লড়াই। তাই ইংরেজ সরকার তাকে যেন কোনো প্রকারেও গ্রেপ্তার না করতে পারে সেজন্য বিরসা গহন অরণ্যে, শৈলরাকাব থেকে বার্তোদি, বার্তোদি থেকে আয়ুভুত, মারংহাড়া বিভিন্ন স্থানে গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অপরদিকে কমিশনার ফর্বস্‌ ও স্ট্রিটিফিল্ড-এর নেতৃত্বে মিলিটারী, পুলিশ, ইংরেজ অফিসার ও দেশীয় রাজন্যবর্গ সকলে শত শত গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললেন বিরসাকে ধরার জন্য, চলল বিরসাইতদের গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ ও নিরীহ বিরসাইতদের উপর অকথ্য অত্যাচার কিন্তু বিরসাকে কোথাও পাওয়া গেল না। শত শত মুণ্ডা বন্দী হয়েও বিরসাকে ধরিয়ে দেয়নি। তারা উল্‌গুলানের মহামন্ত্রে দীক্ষিত, তাদের ভগবান বিরসা একদিন ফিরিয়ে দেবে অরণ্যের অধিকার, ফিরিয়ে দেবে খুটকাট্টি গ্রাম, মুক্ত জীবনের মহোল্লাস। কিন্তু ইংরেজ সরকারের ঘোষিত পুরস্কার পাঁচশো টাকা ও জমির পাট্টার লোভে বিশ্বাসঘাতক শশিভূষণ রাই, মাঝি তামারিয়া ও ছজন মুণ্ডা সকলে মিলে বিরসাকে ধরিয়ে দেয়, বিরসা ইংরেজ সরকারের কাছে ধরা পড়ে গেল, আর বিরসার স্থান হয় জেলখানার সেলে।

অরণ্যের অধিকারের নায়ক বিরসার বিশ্বাস, এবার সে জেল থেকে আর জীবিতাবস্থায় মুক্তি পাবে না। শেষ পরিণাম ইংরেজ সরকারের চরম শাস্তি মহামৃত্যু তার জন্য অপেক্ষমান। তবুও বিরসা স্বপ্ন দেখে মুণ্ডা অধ্যুষিত বাহান্নটি পরগণা নিয়ে গঠিত ছোটনাগপুর থেকে মুণ্ডাদের দুশমন ইংরেজ ও দিকুদের সে বিতাড়িত করবেই। জেলে থাকাকালীন বিরসাকে

ঠিকমতো খেতে দেওয়া হতো না, এমনকি জল পর্যন্ত দেওয়া হতো না। সরকার ভাবলো যেভাবেই হোক বিরসাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, কারণ বাঁচিয়ে রাখলে সে আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। সেজন্য ইংরেজ সরকার অতি গোপনে বিরসার শরীরে বিষ প্রয়োগ করে, ফলে বিরসা আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। প্রকৃত বা সত্য ঘটনা চেপে সুপারের নির্দেশে জেলার রিপোর্ট-এ ১৯০০ সালের ৯ জুন 'এশিয়াটিক কলেরায়' আক্রান্ত হয়ে বিরসা মুণ্ডা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মূলত বিরসার বিচার হল না, পক্ষান্তরে, বিরসা সুবিচার পেল না, সে 'রাজনৈতিক বন্দীর' মর্যাদা তো দূরস্থান, একজন সাধারণ খুনী ও অগ্নিসংযোগে সহায়তাকারীর তকমা দিয়ে তার বিচারের পরিকল্পনা করা হয়। বিরসা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও তার বাঁচবার মধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুণ্ডারা পুনরায় 'উল্‌গুলান' তথা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সর্বনাশা বিদ্রোহের অভ্যুত্থান যে ঘটাবে তা তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করেন। সুতরাং ইংরেজ সরকার কামনা করেছিলেন বিরসার মৃত্যু। তার এই মৃত্যুতে ভেঙে চুরমার হবে মুণ্ডাদের মনোবল, আর ভবিষ্যতে তাদের 'উল্‌গুলান' তথা মহাবিদ্রোহের অভ্যুত্থানের ইতি ঘটবে।

বস্তুত, বিরসার কলেরায় মৃত্যু হয়নি। তার মৃত্যু ঘটেছে অনিবার্য কারণেই—উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে বিরসার মৃত্যু কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত। যেহেতু 'এশিয়াটিক কলেরায়' বিরসার মৃত্যু ইংরেজ সরকার মিথ্যা বলেছিলেন। ইংরেজ সরকারের পক্ষে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনার ক্ষেত্রে এটি অপ্রত্যাশিতও নয়। বরং বিরসার ভগবান হওয়ার বিপক্ষে এ কাহিনী রচনার যৌক্তিকতা সরকারের কাছে আদৌ অযৌক্তিক নয়, কিন্তু মুণ্ডাদের কাছে বিরসা ভগবানই। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের সমাপ্তিতে লক্ষণীয়, সান্‌রে তার ও গয়া মুণ্ডার ফাঁসির সময় গয়া মুণ্ডাকে বলেছে—'কানিস না রে। মরতে মোর সত্যিই ডর নাই। মরতে বিরসাইত ডরে? তাকে মরতে দেখাছিস, সে ডরা ছিল?"[২৬]

লক্ষণীয়, বিরসাইত মুণ্ডারা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বিশ্বাস করে 'বিরসা' কখনো মরতে পারে না, সে যে ভগবান। উপন্যাসের শেষে একথার সততা স্বীকৃতি পায় বাঙালি ক্রিশ্চান অমূল্য আব্রাহামকে 'বিরসা' ও তার 'উল্‌গুলান'-এর অমরত্বে বিশ্বাসী হতে দেখা যায়। উপন্যাসের শেষ বাক্যগুলো অমূল্য আব্রাহামের নোটবই-এ লিপিবদ্ধ তথা স্বগতোক্তির মত শোনালেও মহাশ্বেতার অন্তরধর্মে চিত্রিত সে এক চিরন্তন বিশ্বাসময় জগতের প্রতিলিপি মাত্র। তিনি তুলে ধরেছেন সেই চিরন্তন বাণী—

> "উল্‌গুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উল্‌গুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ নাই। উল্‌গুলানের শেষ নাই। বিরসার মরণ ...।"[২৭]

১৯০০ সালের ৯ই জুন রাঁচি জেলে সকাল ৯.১০ মিনিটে বিরসার মৃত্যু ঘটে। এখানেই কাহিনি শেষ হয়নি। মহাশ্বেতা এর পরেও উপসংহার টেনেছেন। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই বজায় থাকে প্রবহমান চলমানতা। যেখানে স্থিতি, সেখানেই সব শেষ হয়ে যায়। একজনের শূন্যস্থান পূরণ করতে আর একজনের আবির্ভাব ঘটে। তেমনি, কোনো নেতার মৃত্যুতে বিদ্রোহ থেমে যায় না, সেই জায়গা পূরণ করতে অপর নেতার আবির্ভাব ঘটে,

> "কালে-কালান্তরে উত্তরাধিকারের ধারা পথে অব্যহিত থাকে অগ্রগতি। বিদ্রোহ থেকে নেয় বিপ্লব। আমার উপন্যাসের সমাপ্তির পরেও তাই সংযোজন করতে হয় পরিশিষ্ট।"[২৮]

অমূল্যর নোটবই আর ব্যারিস্টার জেকবের সহায়তায় পরিশিষ্টটি জ্ঞাত হয়। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে নিরপরাধ মুণ্ডাদের খালাস করে দেওয়া হয়। কিন্তু গয়া মুণ্ডা, তার ছেলে ও সুখরাম মুণ্ডাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচানো যায়নি। ওদের ফাঁসির পর অমূল্য চাকরিতে ইস্তফা দেয়। চালকাড়ে গিয়ে সে শালীর মুখে শুনেছে—"উল্‌গুলানের শেষ নাই। ভগবানের মরণ নাই।" সে দেখেছিল বিরসার মা করমিকে—যে বিরসার ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে করতে একদিন পাথর হয়ে যাবে। সেই জংলী পরিবেশে বসে অমূল্যর মনে হয়—

> "পরাজয়ে সংগ্রাম শেষ হয় না। থেকে যায়, কেননা, মানুষ থাকে, আমরা থাকি।"[২৯]

বিরসার মন্ত্র, বিরসার প্রেরণা, কারাগারে জন্তুর মতো আবদ্ধ মুণ্ডাদের মধ্যে সঞ্চারিত ছিল। আঠারো বছরের সুগানা

মুণ্ডাকে বিরসা বলেছিল,

> ''যদি বাজ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি বাজ হয়ে ভেঙ্গে পড়ি, তোরা ডরাবি। যদি বাঘ হয়ে ফিরে আসি, তোরা ডরাবি। যদি জানোয়ার হয়ে ফিরে আসি, তোরা মোকে চিনবি না। তাই মানুষ হয়ে ফিরে আসব হে আমি, নতুন ধরতি গড়ে নিব। বাম্ভোন হয়ে এলে, গোঁসাই হয়ে এলে তোরা মোকে চিনবি না। আমি মুণ্ডা হয়ে ফিরে আসব রে, যে মুণ্ডাটা ফের উল্‌গুলানের কথা বলবে, তারে আমি বলে চিনে নিবি।''[৩০]

বিরসার এই মহান বাণী থেকে আমাদের বুঝতে হবে, যুগ থেকে যুগান্তর, কাল থেকে কালান্তর অতিবাহিত হলেও বিরসা আবার একমাত্র মুণ্ডার ঘরেই জন্ম নেবে। সে চায় মুক্ত আলো মুক্ত বায়ু। কিন্তু বিরসার 'উল্‌গুলান' বিরসাইতরা করবে, যতদিন তারা ইংরেজ শাসক এবং জমিদারদের কাছ থেকে নিজেদের জমির অধিকার সত্ব লাভ করতে না পারবে ততদিন তাদের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম থামবে না। বিরসা মনে করে সে আবার মুণ্ডা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে ফিরিয়ে আনবে আদিবাসীদের 'ভূমি সত্ত্বা' অরণ্যের অধিকার। এই অরণ্যকে আদিবাসীরা 'মা' বলে পূজা করে। তাই দিকুদের হাতে অপমানের হাত থেকে মাকে রক্ষা করতে হবে। এটাই তাদের মাতৃমুক্তির পণ। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেখিয়েছেন—বিরসার মৃত্যু হলেও মুণ্ডাদের মধ্যে আরো জন্ম নেবে শত শত বিরসা। যারা উল্‌গুলানের মাধ্যমে তারা দিকুদের হাত থেকে আদায় করে নেবে 'অরণ্যের অধিকার'। বিরসার বিদ্রোহী সত্ত্বা প্রজন্মের পর নতুন প্রজন্মের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো অবিরাম চলতে থাকবে। সত্যিই একদিন ফিরে পাবে তাদের হারানো সত্ত্বা অরণ্যের অধিকার। তাই 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসকে মুণ্ডা জাতির অন্যতম দলিল রূপে অভিহিত করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, অভিজিৎ সেন, 'মহাশ্বেতা : প্রবাহিনী নদীর নাম', কলকাতা, ২০০২, ভূমিকা, পৃ. ১২।

২. মহাশ্বেতা দেবী রচনা সমগ্র, ৫ম খণ্ড, 'নতুন সংস্করণের ভূমিকা', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৯।

৩. মহাশ্বেতা, সম্পাদিত : তাপস ভৌমিক, বিজিতকুমার দত্ত, 'চোট্টিমুণ্ডা এবং তার তীর', কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৫৮।

৪. 'বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ', সুবোধ দেবসেন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ-২০১০, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ. ২০৬।

৫. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭।

৬. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৫।

৭. তদেব, পৃ. ৩৮।

৮. তদেব, পৃ. ৮৫।

৯. তদেব, পৃ. ৮৫।

১০. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৯০।

১১. তদেব, পৃ. ৯১।

১২. তদেব, পৃ. ১১২।

১৩. তদেব, পৃ. ১১৪।

১৪. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১১৪।

১৫. তদেব, পৃ. ১২৬।

১৬. তদেব, পৃ. ১৬৫।
১৭. তদেব, পৃ. ১৯৭।
১৮. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৯৭।
১৯. তদেব, পৃ. ১৯৭।
২০. তদেব, পৃ. ২১৫।
২১. তদেব, পৃ. ৩২২।
২২. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২২০।
২৩. তদেব, পৃ. ৩৩৬।
২৪. তদেব, পৃ. ২৪৪।
২৫. তদেব, পৃ. ২৫৩।
২৬. মহাশ্বেতা দেবী, 'অরণ্যের অধিকার', 'ভূমিকা', করুণা প্রকাশনী, একাদশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৩১৯।
২৭. তদেব, পৃ. ৩২৭।
২৮. তদেব, পৃ. ৩২৮।
২৯. তদেব, পৃ. ১৮।
৩০. তদেব, পৃ. ৩১০।

বিপুল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
শ্রীকৃষ্ণ কলেজ, বগুলা, নদীয়া।

বাংলা রূপকথার ভগীরথ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

সুব্রত দাস

প্রবেশক

শিশু মনোরঞ্জনের বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে রূপকথার গল্প বাংলার শৈশবজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। রাজপুত্র-রাজকন্যার গল্পে রাক্ষস-খোক্কস, সোনার কাঠি-রূপোর কাঠি, পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ ছোটদের মনে চূড়ান্ত বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছে যুগ-যুগান্ত ধরে। রূপকথার এই মনোমুগ্ধকর গল্পগুলি মৌখিক সাহিত্য রূপে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষায় ছোটদের সামনে এই রূপকথাগুলি গ্রন্থাকারে প্রথম পরিবেশন করেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭)। অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁদের আদি নিবাস ময়মনসিং জেলা। এই ময়মনসিং জেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে তিনি রূপকথার গল্প সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯০৭ সালে এরই ফলশ্রুতিতে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'ঠাকুরমার ঝুলি'। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'ঠাকুরমার ঝুলি' তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র ভূমিকাতে লেখেন—"রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।" দক্ষিণারঞ্জনের হাতে বাংলা রূপকথার গল্পের বিশিষ্ট রূপটি গড়ে উঠেছে।

বিস্তার

রাজপুত্র, রাজা-রাণী, রাক্ষসের সঙ্গে শিশুর বিস্ময়মাখানো হৃদয়ের যোগাযোগ অনাদিকাল থেকেই। বিশেষত "বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণচিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।"[১] অথচ উনিশ শতকে রূপকথার নামে যে সাহিত্য পরিবেশিত হয়েছে তা বাংলার জল-হাওয়ায় লালিত নয়। জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির লোককথা গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়, অ্যাণ্ডারসনের সৌজন্যে বাংলায় পরিবেশিত হয়েছে অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বঙ্গভাণ্ডারের মণিমুক্তার কথা ভুলে এইভাবে পরানুগ্রহে রসতৃপ্তি যে সমকালীন পাঠকের মনে অতৃপ্তির জন্ম দিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের কথায়—"ঠাকুমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল। .... কোথা গেল-রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমাবেঙ্গমী, কোথায়—সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের সাতরাজার ধন মানিক!"[২] বাংলার হৃদয়ের সামগ্রী রূপকথার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। রূপকথার আটপৌঢ়ে সহজ-সরল কাহিনি, রাজপুত্র, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, অচিরেই বাঙালি শিশুর অন্তরে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করলো। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংকলিত কাহিনিগুলির দৌলতে হয়ে উঠলেন বাংলা রূপকথার মুকুটহীন সম্রাট।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত উনাইলে দক্ষিণারঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রমদারঞ্জন মিত্রমজুমদার ময়মনসিংহ জেলায় তাদের জমিদারী ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের পাঁচবছর বয়সে তারা মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসেন। দক্ষিণারঞ্জন গ্রামবাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে থাকা অজস্র লোককথা, রূপকথা, কিংবদন্তীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এল ১৯০৩ সালে। বহরমপুরের পড়াশোনার পাট চুকিয়ে তিনি চলে এলেন ময়মনসিংয়ে। পদ্মাপারে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখাশোনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে কাছ থেকে চিনেছিলেন

দাস, সুব্রত : বাংলা রূপকথার ভগীরথ : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 26-32, ISSN 2249-4332

প্রকৃতি ও মানুষকে। দক্ষিণারঞ্জন পিসির জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন পূর্ববাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। সেখানে লোককথা রূপকথার ভাণ্ডারী গ্রামীণ বয়োঃবৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এইসময় তাঁর সাথে পরিচয় হয় 'বৃহৎবঙ্গে'র লেখক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের। দীনেশচন্দ্রের উৎসাহে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭)। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বইটি এখনও পর্যন্ত শিশুদের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। দক্ষিণারঞ্জনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'উত্থান' (১৯০২), 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭), 'আহুতি' (১৯০৮), 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯), 'সচিত্র সরলচণ্ডী' (১৯০১), 'খোকাখুকুর খেলা' (১৯০৯), 'আর্যনারী' (১৯০৮, ১৯১০), 'চারুহারু' (১৯১২), 'আসার বই' (১৯১২), 'দাদামশায়ের থলে' (১৯১৩), 'ফার্স্টবয়, লাস্টবয়' (১৯২৭), 'উৎপল ও রবি' (১৯২৮) , 'কিশোরদের মন' (১৯৩৪), 'বাংলার সোনার ছেলে' (১৯৩৭), 'সবুজ লেখা' (১৯৩৮), 'পৃথিবীর রূপকথা' (১৯৪০) , 'চিরদিনের রূপকথা' (১৯৪৭) ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন 'মাসিক বসুধা', 'মাসিক সারথি', 'পথ' প্রভৃতি শিশুসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এছাড়াও 'প্রদীপ', 'প্রকৃতি', 'ভারতী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় দক্ষিণারঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হয়। ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় তাঁর 'চারুহারু' নামে কিশোর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটদের জন্য সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন শিশু-সংগঠনের সঙ্গে। তিনি কলকাতার নিখিলবঙ্গ মণিমেলা মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপতি রূপে মনোনীত হন।

(২)

দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামক রূপকথা সংকলন গ্রন্থটির জন্য। ইতিপূর্বে বাংলার লোককথা-রূপকথা সংকলনের কাজ করেছিলেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। লালবিহারী সংকলিত রূপকথাগুলি লেখা হয় ইংরেজি ভাষায়। সুতরাং আদ্যন্ত রূপকথা নিয়ে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের প্রাথমিক কৃতিত্ব দক্ষিণারঞ্জনের। অবশ্য দক্ষিণারঞ্জনের সমসাময়িক জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত তাঁর 'উপকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় দাবী করেছিলেন যে, তিনিই বাংলাভাষার প্রথম রূপকথা সংগ্রাহক—"এইরূপ উপকথার পুস্তক ইহার পূর্বে বঙ্গ ভাষায় আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না, অন্তত আমি সেইরূপ কোন পুস্তক এ পর্যন্ত দেখি নাই।"[৩] কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রশশীর এই দাবী যথার্থ নয়। Bengal Library Catalogue এর তালিকা অনুযায়ী 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রথম প্রকাশকাল ১৬ অক্টোবর ১৯০৭। আর জ্ঞানেন্দ্রশশীর 'উপকথা' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তর 'উপকথা'র ঈষৎ পূর্ববর্তী।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' সংকলনের পিছনে সমকালীন যুগমানসের চাহিদা সক্রিয় ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাংলার মানুষকে ঐতিহ্যমুখী করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> "বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহুকোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাঙলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই।"[৪]

বাংলাদেশের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ দে বাংলার ময়মনসিংহের গল্পগুলি, রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)-এর দুয়ার উন্মোচন করলেন। দীনেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর স্বদেশ সংগ্রহের অমূল্য মণি-কাঞ্চন ছড়িয়ে দিতে চাইলেন স্বদেশি কাহিনি পরিবেশন করার আত্যন্তিক ইচ্ছায়। তাই তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশি জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে?"[৫] 'স্বদেশী জিনিষ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রেক্ষিত ও ইতিহাস সুচিহ্নিত

করেছেন।

রূপকথা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলার শিশুরা রূপকথা শোনে শুধুমাত্র তার কাহিনির জন্য নয়, 'বাংলাদেশের স্নেহের চিরন্তন' সুরটি সেখানে খুঁজে পায় সে। অথচ 'আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা' কেটে যাবার সংকটকাল তখনও ছিল, আজ তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন সেই আটপৌরে গ্রাম্যসুরটির সন্ধান দিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। গ্রামবাংলার খাঁটি নির্যাসটুকু পাওয়া গেল দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত রূপকথাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ তাই 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় লেখেন—

> ''দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি 'ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীনর সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্মরসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।''[৬]

এই সরসতা ও নিজস্বতার কারণ বোধ হয় এই যে, দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলিতে নাগরিক হস্তাবলেপন করেননি। ময়মনসিংয়ের গ্রাম্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে মোমের রেকর্ডে যে রূপকথা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা-ই তিনি অবিকৃতভাবে ও অপরিবর্তিতরূপে প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। ফলে ঠাকুরমার মুখের কথাতে যেন রূপকথার নির্ভেজাল খাঁটি রূপটিই ধরা পড়েছে।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে প্রকাশিত রূপকথার সংখ্যা চোদ্দটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি কবিতা। সংকলক দক্ষিণারঞ্জন এই রূপকথাগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন—'দুধের সাগর', 'রূপ-তরসী' এবং 'চ্যাংব্যাং'। 'দুধের সাগর'-এ স্থান পেয়েছে ছয়টি গল্প, 'রূপ-তরসী' ও 'চ্যাংব্যাং'-এ চারটি করে গল্প আছে। এই তিনটি বিভাগে পরিবেশিত গল্পগুলি হলো—

'দুধের সাগর'— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘুমন্তপুরী', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাত ভাই চম্পা', 'শীতবসন্ত', 'কিরণমালা'।

'রূপ-তরাসী'— 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতালকন্যা মণিমালা', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি'।

'চ্যাংব্যাং'— 'শিয়ালপণ্ডিত', 'সুখু আর দুখু', 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী', 'দেড় আঙুলে'।

এই গল্পগুলি ছাড়াও এই গ্রন্থে 'সোনা ঘুমাল' এবং 'ফুরাল' নামে দুটি ছড়া সংকলিত হয়েছে।

(৩)

রূপকথার গল্পে সাধারণত অপুত্রক রাজার দৈবী উপায়ে পুত্রলাভের প্রসঙ্গ থাকে। 'কলাবতী রাজকন্যা'তে, সেই একই পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে গল্প। এক রাজার সাতরাণী। রাজা অপুত্রক। তাই বড় দুঃখী তিনি। তারপর একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন তার রাজ্যে। রাজার হাতে একটি শিকড় দিয়ে বললেন সাত রাণীকে বেটে খাওয়ানোর কথা। বড় ছয়রাণী ছোট রাণীকে না জানিয়ে সেই শিকড় বেটে খেয়ে নিল। ছোট রাণী জানতে পেরে সেই শিকড়বাটা শিল-নোড়া ধুয়ে তার জল খেলেন। পরিণামে বুদ্ধু ও ভূতুম নামে তার দুটি কিম্ভূত-কিমাকার মনুষ্যেতর সন্তান জন্মালো। ছোট রাণীর লাঞ্ছনার শেষ রইল না। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধু ও ভূতুমের কল্যাণেই তার মায়ের দুঃখ ঘুঁচলো।

'সাত ভাই চম্পা' গল্পেও রাজার সাতরাণী। বড় ছয়রাণী অপুত্রক। ছোটরাণী সন্তান-সম্ভবা হলে বড় রাণীরা প্রমাদ গোনে। ভাবে ছোটরাণী সন্তানের জন্ম দিলে সেই হয়ে উঠবে রাজার সর্বেসর্বা। ফলে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ছোটরাণী একে একে সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিল। 'আহা ছেলে-মেয়েগুলি যেন চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি'। অন্য রাণীরা সেই সদ্য জন্মানো বাচ্চাদের হাঁড়ি-সরাতে করে ছাইয়ের গাদাতে পুঁতে দেয়। আর তারা প্রচার করে রাণী ইঁদুর, কাঁকড়া, বিড়াল ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে। রাজা ছোটরাণীর উপর বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। রাণী বনের মধ্যে কুটির

বেঁধে ঘুঁটে কুড়ানীর জীবন কাটাতে লাগল। রাণীর মাটিতে পুঁতে দেওয়া সেই সাতটি ছেলে চাঁপা বা চম্পাফুল হয়ে ফুটল। আর মেয়েটি হলো পারুল ফুল। রাজা তাদের দেখে মুগ্ধ হলেন। পরে সেই ফুল তুলতে গেলে পারুলফুল জানায় যে রাজা ও তার ঘুঁটে কুড়ানী দাসী এলেই ফুল তোলা যাবে, নচেৎ নয়। খবর পেয়ে রাজা এলেন। তিনি সব কথা শুনলেন পারুলের মুখে। পারুল ও সাত ভাই চম্পা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলে মেয়ে হয়ে ঘুঁটে কুড়ানী ছোট রাণীর কোলে। বড়ো রাণীরা সমুচিত শাস্তি পেল। ছোটরাণী রাজারাণী হয়ে ছেলে মেয়ের সঙ্গে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

'সাত ভাই চম্পা'র মতো আরও একটি জনপ্রিয় গল্প 'নীলকমল আর লালকমল'। এক রাক্ষসী, লালকমল, নীলকমলের মা রাণী সেজে রাজপ্রাসাদে বাস করে। সেই রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা বন্দী আছে এক কৌটোয়। মায়ার দ্বারা রাক্ষসী রাণী সমস্ত রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লালকমল, নীলকমল সেই ছদ্মবেশী রাণীকে হত্যা করে রাজ্য উদ্ধার করেছে। 'ডালিমকুমার' গল্পে ডালিমের মাকে হত্যা করে রাক্ষসী রাণী ডালিমকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এক্ষেত্রেও ডালিম রাক্ষসী রাণীকে হত্যা করে রাজ্য রক্ষা করেছে। নীলকমলের জন্ম রাক্ষসীর গর্ভে। লাল ডিম ফুটে লালকমল আর নীল ডিম ফুটে জন্ম নীলকমলের। লালকমল আর ডালিমকুমারের জন্ম কিন্তু সাধারণ মানবীর গর্ভে। তৎসত্ত্বেও তারা রূপকথার নায়ক। লালকমলকে মানুষ বলে রাক্ষসের দেশে আয়ী বুড়ি তার গায়ে 'মনিষ্যি মনিষ্যি গন্ধ' পেয়েছে। ডালিমকুমার এবং লালকমলদের জয় কিন্তু রূপকথার ভালো এবং মন্দের লড়াইয়ে ভালোর জয়কে চিহ্নিত করেছে। রূপকথার বর্ণনায় অপার্থিব অলৌকিকত্ব থাকে। ডালিমকুমারের শত্রু সাপটি লেখকের বর্ণনায়—

> "ঘরের আলো, বিদ্যুতের চমক-রাজকন্যার শরীর কাঠের মতো শক্ত—রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে সরু মিহি চুলের মত সাপ বাহির হইল। সেই চুল দেখিতে দেখিতে সূতা-দড়া-কাছ, তারপর প্রচণ্ড অজগর। শঙ্খের মত আওয়াজে সেই অজগর গর্জিয়া উঠিল।"[৭]

'চ্যাংব্যাং'-এর 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পটির উপাদান লোককথা থেকে আহৃত। ইতিপূর্বে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই একই গল্প সংকলন করেছিলেন। গল্পটি এক চতুর শিয়ালকে নিয়ে। বন্ধু কুমির তার সাত ছানাকে শিয়ালের মতো বুদ্ধিমান তৈরি করার জন্য ভর্তি করেছিল শিয়ালের পাঠশালায়। শিয়াল মহানন্দে তাদের খেয়েছে। কুমির শিয়ালের কিছু করতে না পারলেও দৈবক্রমে শিয়াল তার উচিত কর্মের সাজা পেয়েছে। বেগুন ক্ষেতে বেগুন খেতে গিয়ে তার নাকে কাঁটা ফোটার পর, নাপিত শিয়ালের নাক কেটে দেয়। নাকের পরিবর্তে নাপিত তাকে নরুণ দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই কাটা নাকের দৌলতে শিয়ালের কপালে জুটলো এক বউ। ঢুলি বউ শিয়ালের বউকে কেটে ফেললে শিয়াল পরিবর্তে পেল ঢোল। তালগাছে চড়ে মনের আনন্দে ঢোল বাজাতে গিয়ে শিয়াল পড়ে মারা গেল।

'সুখু আর দুখু' গল্পে দুষ্ট সুখ তার ঈর্ষা পরায়ণতার জন্য শাস্তি ভোগ করেছে। এক তাঁতির দুই বউ। তাঁতির মৃত্যুর পর বড়বউ, ছোটবউকে আলাদা করে দেয়। ছোটবউয়ের মেয়ের নাম দুখু। দুখু খুব দয়ালু আর শান্ত স্বভাবের মেয়ে। শত দুঃখের মধ্যেও সে অন্যকে সাহায্য করতে ভোলে না। সুখু ঠিক বিপরীত। সে তার মায়ের মতোই ঈর্ষা পরায়ণ। দুখু চাঁদের বুড়ির কৃপায় পুকুরে ডুব দিয়ে অফুরন্ত সৌন্দর্য লাভ করে। সঙ্গে পায় বহু মূল্যবান গয়না। দুখুর ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি দেখে সুখুর মা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে গেল। সে সুখুকে সৌন্দর্য ও ধনসম্পদের লোভে পুকুরে পাঠালো। সুখু লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তিন ডুব দিল পুকুরে। ফলে মুহূর্তেই সে হয়ে গেল ভয়ানক কুৎসিত। তার হাতের পোঁটলা থেকে অজগর বের হয়ে সুখুকে মেরে ফেললো। এইভাবে রূপকথার শেষে শুভর জয়, অশুভর পরাজয় ঘোষিত হয়েছে বারবার। দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথাতে শুভ চিহ্নিত হয়েছে প্রাণের প্রতীকরূপে। আর অশুভ মৃত্যুর প্রতীকরূপে। ডালিমকুমার রাক্ষসের দেশে গিয়ে মৃত্যুর রাজ্যে প্রত্যক্ষ করেছে ভয়ানক নারকীয় পরিবেশ—

> "হাড়ের পাহাড়ের নীচে কলকল শব্দে রক্ত-নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে; রক্তের তরঙ্গ, রক্তের ঢেউ! দাঁত বাহির করিয়া মড়ার মুণ্ড হী! হী! করিয়া উঠে, হাড়ে হাড়ে কটাকট খটাখট শব্দ।"[৮]

(৪)

দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথার নিজস্ব আমেজ এবং চলন ঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। বিশেষত রূপকথার সহজাত আটপৌরে ভাষাকে তিনি যথাযথভাবে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন তাঁর সংকলনে। কিন্তু 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রকাশিত হবার পর সমালোচক মহলে বইটির ভাষা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। ভাষার দুর্বোধ্যতা ও প্রাদেশিক বাক্যাবলী রূপকথার যথার্থ রসগ্রহণের প্রধান অন্তরায়, এইরকম মনোভাব লক্ষ করে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বিভিন্ন স্থলে ভাষাগত পরিবর্তন করেন। যেমন 'পুষ্পমালা' গল্পের প্রথম সংস্করণে ছিল—

> ''রাজকন্যা শেষে পালঙ্ক মাথার বেণী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ—মাটি বড় শক্ত, মাটি বড় তপ্ত। পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা উদল মাথা, উদল গা, জলের তলে দু'খান পা, সরোবরের ঘাটে গিয়া বসিলেন।''[৯]

'পুষ্পমালা'র দ্বাদশ সংস্করণে তিনি একেই পরিবর্তিত করে লিখলেন—

> ''রাজকন্যা শেষ পালঙ্ক উল্টাইয়া মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ!—মাটি বড় শক্ত মাটি বড় তপ্ত! সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া, পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা সরোবরের ঘাটে গিয়া জলের তলে পা রাখিয়া বসিলেন।''[১০]

'মালঞ্চমালা' গল্পের প্রথম সংস্করণে আছে—

> ''মালঞ্চ দিল রাজরাজত্ব মুক্তি, মালঞ্চ ধরিল ঘোড়া? মালঞ্চ তো হাতকাটা নাক কাটা 'অন্ধ চোক পানের বাটা' সে মালঞ্চ গেল পুত্রের সাথে সে মালঞ্চ খাইল ভূতে-প্রেতে—সে মালঞ্চ আসবে কোথায়?''[১১]

'মালঞ্চমালা'র দ্বাদশ সংস্করণে আছে—

> ''মালঞ্চ রাজত্ব মুক্তি দিল? মালঞ্চ ঘোড়া ধরিল?—সে মালঞ্চের যে হাত কাটিয়াছিলাম, নাক কাটিয়াছিলাম, কত শাস্তি করিয়াছিলাম।—আহা! সেই মালঞ্চ এল।''[১২]

প্রথম সংস্করণ ও দ্বাদশ সংস্করণের মধ্যে যে এই ভাষাগত রূপান্তর ও পরিবর্তন, তা রূপকথার আদি অকৃত্রিম রূপের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় রূপকথার উপর 'আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতে'র ফলা চালনার ফলে রূপকথার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। কেতাবী ভাষায় রূপকথার প্রকৃত বিস্তার সম্ভব নয়, একথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গ্রাম্য লৌকিক ভাষার। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দক্ষিণারঞ্জন তাঁর স্বকীয়তা বর্জন করে রূপকথা বর্ণনা করতে গিয়ে লৌকিক বাক্‌রীতি পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন পরিশীলিত, মার্জিত ভাষারীতির—

> ''দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমালোচক-গণের তাড়া খাইয়া দক্ষিণাবাবু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদার ঝুলির ভাষা কতকটা সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত মূল্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ গল্পভূক্ সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।''[১৩]

ভাষাগত পরিবর্তন করলেও, দক্ষিণারঞ্জন রূপকথার মূল কাহিনি প্রায় অপরিবর্তিত রেখেছেন। রূপকথার 'মোটিফ'ও চারিত্রিক লক্ষণ যাতে তাঁর সংকলিত কাহিনিগুলিতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেদিকে তাঁর সতর্ক নজর ছিল। ফলে রূপকথার প্রচুর মোটিফের সন্ধান মেলে তাঁর গল্পগুলিতে। দক্ষিণারঞ্জনের গল্পগুলিতে অপুত্রক নিঃসন্তান রাজা, ঈর্ষাপরায়ণ রাণী, সন্তান লাভের দৈবী উপায়ের মোটিফ ঘুরে ফিরে এসেছে। 'সাত ভাই চম্পা' গল্পে 'কথাবলা ফুল', 'যাদুফুল', 'সুখু আর দুখু' গল্পে 'কথাবলা গরু', 'সোনার ফল', 'কামধেনু', 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' গল্পে 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি', 'প্রাণ ভোমরা' প্রভৃতি মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। 'শীতবসন্ত'র কবিতায় 'গজমতি' মোটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে—

"ক্ষীর সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল ঢল করে
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তা'রি মাঝে কি?
দুধের বরণ হাতির মাথে—'গজমোতি'।"[১৪]

দক্ষিণারঞ্জনের অধিকাংশ রূপকথাতে ঈর্ষাপরাণয় রাণীদের খোঁজ পাওয়া যায়। তারা রাজার পুত্র কন্যাদের হত্যা করছে, জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে কিংবা পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে। আবার কাহিনির শেষে সেই হারানো রাজপুত্র-কন্যারা ফিরে পেয়েছে নব জীবন। রাজার সম্বিত ফিরলে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করেন সেই দুষ্টু রাণীদের। যেমন 'সাত ভাই চম্পা'তে ষড়যন্ত্রকারী ছয় রাণীকে রাজা হেঁটোয় কাঁটা, পিছনে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেললেন। 'লাল কমল নীল কমলে' কৌটোর ভিতরে রাখা ভোমরাকে হত্যা করে শাস্তি দেওয়া হয় রাক্ষসী রাণীর। এইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে ছোটদের মনে শুভাশুভ বোধ জাগ্রত করে রূপকথা। শিশুরা মনে মনে খারাপ লোকটির শাস্তিকামনা করে বলেই, দক্ষিণারঞ্জনের রাক্ষস কিংবা দুষ্টু রাণীরা সাজা পায়।

দক্ষিণারঞ্জনের গল্পগুলি লৌকিক জীবনের। তাই শ্বাশত লোকজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি, সুখ, ঐশ্বর্য এবং সমানাধিকার মানুষের পরমকাঙ্খিত বিষয়। সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে রূপকথায়। রূপকথার রাজপুত্রেরা পাতালপুরীতে গিয়ে উদ্ধার করে আনে রাজকন্যা আর অযুত ধনরাশি। কিংবা 'দেড় আঙুলে' গল্পের দেড় আঙুল উচ্চতা বিশিষ্ট ছেলেটি তার প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে পিতাকে ক্রীতদাসত্বের থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ করে। নিজের ক্ষুদ্রত্ব দীনতাকে উপেক্ষা করে উন্নততর জীবনের সন্ধান পাওয়ার দুর্দম ইচ্ছাই এখানে সক্রিয়।

রূপকথার মধ্যে সামাজিক বিন্যাসটিও ধরা পড়েছে। 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা' গল্পে দাসী কাঁকনমালা রাণী কাঞ্চনমালার পোষাক পরে রাণী সেজে বসেছে। বাল্যবন্ধু রাখাল ছদ্মবেশে এসে দাসী ও রাণীর পরীক্ষার জন্য বেছে নেন 'পিটকুড়ুলির ব্রত'র অনুষ্ঠানকে। রাখালবন্ধুর নির্দেশ মতো রাণী তৈরি করেন 'অস্কেপিঠা, চাস্কে পিঠা ও সাস্কে পিঠা'। দাসী করেন 'চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীরমুরলী'। আলপনা দেবার সময়ও রাণীর পরাজয় ঘটলো দাসীর কাছে। সে আঁকল পদ্মলতা, সোনার সাতকলস, ধানের ছড়া প্রভৃতি। প্রমাণ হয় যে রাণীর ছদ্মবেশে আছে দাসী, আর দাসী হল প্রকৃতপক্ষে রাণী। কেননা আস্কে পিঠে, বাস্কে পিঠে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির অঙ্গ, আর চন্দ্রপুলি, ক্ষীরমুরলী উচ্চবর্গের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

সবমিলিয়ে বলা চলে যে, দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্য যে রূপকথার জগৎ নির্মাণ করেছেন, সেখানে শিশুদের যাতায়াত অবাধ। কেননা আপাতভাবে যা তাদের কাছে অবাস্তব, অলীক, তা-ই পরম বাস্তব শিশুদের কাছে। শিশুমনের কাছে সবই বাস্তব—পক্ষীরাজ ঘোড়া বাস্তব, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বাস্তব, পরী বাস্তব, কথাবলা পাখী বাস্তব, অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব বাস্তব; তার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'রূপকথাগুলিতে যে অবাস্তবতার ছড়াছড়ি তার কারণ, মূলত এগুলি শিশুদের জন্য মুখে মুখে রচিত এবং রচয়িতারাও ছিলেন শিশুর মতো সরল মনের।"[১৫] এই অপরূপ বাস্তব-সম্ভব রূপকথার জগৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে বাংলার প্রাণের সম্পদ রূপে দেখা দিয়েছে বলেই ঋষি অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে বলেছেন—"The Book has marked out on epoch in our literature."। জার্মানির গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়, বা সুইস লেখক আণ্ডারসন রূপকথার গল্প সংগ্রাহক রূপে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। বাংলার দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' সংকলন করে, তাঁদের সঙ্গে ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করেছেন।

শেষের কথা

রূপকথার সংকলন ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্য উপন্যাস লেখার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'চারু ও হারু' এবং 'উৎপল ও রবি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি বই। যদিও এগুলি উপন্যাস নয়। বড় গল্প। চারু ও হারু সমবয়স্ক দুই

বালক। অবস্থানগত পার্থক্যের মতই তাদের চরিত্রগত পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। চারু জমিদার বংশের সন্তান। তাই ধনগর্বে গর্বিত। পিতার প্রশ্রয়ে সে প্রায় উচ্ছন্নে গেছে। অন্যদিকে হারুর জীবন কষ্ট লাঞ্ছিত। দরিদ্র হওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে জীবনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সে তার মনোবল কিংবা চারিত্রিক আদর্শের কথা ভুলে যায় নি। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে স্কুল ইন্সপেক্টরের হাত থেকে পুরস্কার লাভ করেছে। 'চারু ও হারু' উপন্যাসটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনুকূল শাস্ত্রী সম্পাদিত 'তোষিণী' পত্রিকায় (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জি

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, হীরক-জয়ন্তী পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৯।
২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।
৩. বসু, মলয়, বাংলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা, কলকাতা, কে. পি. বাগচি এণ্ড কোং, ১৯৮০, পৃষ্ঠা - ৫৯।
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়া-সম্মিলন, ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, নভেম্বর, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১৮০।
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, ঠাকুরমার ঝুলি, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, হীরক-জয়ন্তী পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৯।
৬. ঐ, পৃষ্ঠা - ১০।
৭. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, ডালিমকুমার, ঠাকুরমার ঝুলি, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, হীরক-জয়ন্তী পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৭০।
৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৭২।
৯. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পুষ্পমালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৮২।
১০. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, পুষ্পমালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৮২।
১১. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, মালঞ্চমালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৭১।
১২. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, মালঞ্চমালা, ঠাকুরদাদার ঝুলি, মিত্র ও ঘোষ, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৯২।
১৩. সেন, দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, গ্রন্থপীঠ, নবম সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা - ৮০।
১৪. মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, শীতবসন্ত, ঠাকুরমার ঝুলি, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, হীরক জয়ন্তী পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১০১।
১৫. চক্রবর্তী, বরুণকুমার, শতবর্ষের পরেও আপনজন, পরশপাথর, সেপ্টেম্বর, ২০০৭।

সুব্রত দাস
সহ-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গভর্মেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, কালনা, পূর্ব বর্ধমান।

বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাসমিশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' ও 'একাল' : তুলনার প্রেক্ষিতে

লিপিকা বিশ্বাস

পটভূমি :

জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ সঞ্চারে সাহিত্যের যে ধারা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গদ্যময় প্রতিমারূপে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছিল, তার নাম উপন্যাস। এর নির্মাণকর্তা হলেন ঔপন্যাসিক। যিনি নির্ভীক, নিরাসক্ত, সংস্কারমুক্ত হয়ে কল্পিত কথনে জীবনের বাস্তবতার নানা ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ উপন্যাস হলো জীবনের শিল্পীত রূপের আকার, যেখানে কাহিনিকার জীবনবোধে, স্বদেশে, সমাঞ্চলে, সমাজে ও অতীতে ঘটে যাওয়া নানা পরিবর্তনকে নিজস্ব ভাবনায় সাজিয়ে তোলেন। আর সেই কাহিনি থেকে অতীত, বর্তমানকে অতি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাসের শুরুর সময়কাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, এইসময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত উপন্যাসের ধারায় নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল অতীত ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। তাঁর রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) প্রথম সার্থক উপন্যাস যা লেখা হয়েছিল অতীত ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে। ঊনিশ শতকে ইতিহাসের প্রতি অগাধ ভালোবাসা থেকেই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লেখার বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই প্রয়াস আর কখনো থেমে যায় নি বরং উপন্যাসে নানা বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলেছে। তবে ইতিহাসের বিষয় উপন্যাসে যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল, সে গতি কখনো ম্লান হয়নি, বরং ইতিহাসের ভাবনা উপন্যাসে অন্য আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। তাই উপন্যাস রচনার শুরুর সময়কাল থেকে বর্তমান সময়ে পর্যন্ত ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস নানা ভাব ও ভাবনায় বিভূষিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—

> "…. কালপ্রবাহের একটি বিশেষ শক্তি আছে, তাকে কোন মতে অস্বীকার করা চলে না। এই অনস্বীকার্য শক্তির অর্থ হাওয়ায় গা ভাসানো নয়। মানুষই রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তৈরি করে। এককথায় মানুষের হাতেই তৈরি হয় ইতিহাস। আবার এই মানুষই তার আচার-ব্যবহারে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, বিবেকহীনতায়, সেই অনিবার্য কালপ্রবাহকে ঘনিয়ে তোলে।"[১]

অর্থাৎ কালপ্রবাহের মুখে পড়ে ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতির বদল ঘটে, আর সময়ের সাথে সাথে ঔপন্যাসিকের কলমে অতীত ও বাস্তবের মেলবন্ধনে তা অন্য মাত্রা পায়। ফলে ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস ভিন্ন সময়ে ভিন্ন মেজাজে ধরা পড়ে। উপন্যাসের শুরুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসের আশ্রয়ে উপন্যাসে লেখার প্রবণতা চলছেই, যা কখনো থেমে যাবে না। তবে শুরুর সময়কাল ও বর্তমানের সময়কালে ঔপন্যাসিকের লেখার মধ্যে ভিন্নতার আস্বাদ মেলে। সে কারণে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' ও 'একাল'—এই বিষয়টি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমেই বলতে হয় উপন্যাসের বিষয় 'ইতিহাস' হওয়ার নেপথ্যে বেশ কতগুলি কারণ ছিল সে কারণগুলি অবশ্যই খুঁজে বের করার প্রয়োজন।

ক) উনিশ শতকে ইতিহাসবিহীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে তা জানা, এবং জনগণের ইতিহাসের প্রতি প্রীতি জন্মানো একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

খ) মানুষের মৌলিক চাওয়ার প্রথম অঙ্গ হিসাবে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সত্যকে অবশ্যই জানা, আর এই সত্যকে জানার আগ্রহে 'ইতিহাসের' বিষয় নিয়ে কাহিনির প্রতি পাঠকের খুব আগ্রহ থাকাটাও স্বাভাবিক।

গ) উপন্যাস রচনায় সূচনায় উপন্যাস পড়ার নেশা যেমন পাঠকের ছিল, তেমনি ইতিহাসের রোমান্স রঙিন প্রেক্ষাপটে

বিশ্বাস, লিপিকা : বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাসমিশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' ও 'একাল' : তুলনার প্রেক্ষিতে
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 33-41, ISSN 2249-4332

যুদ্ধ বিগ্রহ, বীরত্ব, দেশপ্রেম এসব বিষয় জানার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো। ফলে ঔপন্যাসিক এদিকেও বিশেষ ধ্যান দিয়েছিলেন।

ঘ) এছাড়াও উনিশ শতকীয় জনমানসে দেশ ও দশের কাজে নিয়োজিত হয়ে বিরোধীশক্তি অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখা অত্যন্ত জরুরি ছিল। সে কারণে ঔপন্যাসিকেরা এই শ্রেণির উপন্যাস লেখায় মনোনিবেশ করেছেন।

ঙ) অন্যদিকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে, অতীতের ঐতিহাসিক বীর চরিত্রকে খুঁজে বের করতে ঔপন্যাসিকেরা বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। ফলে শুরুর দিকে বেশির ভাগ উপন্যাসে বীর চরিত্রের সন্ধান মেলে।

এছাড়াও নানাবিধ কারণে সমকালীন সমস্যা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অতীতের গৌরবগাথাকে মনে রেখে ঔপন্যাসিকেরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সামিল হয়েছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এই ভাবনা প্রথম প্রতীয়মান হয়, তবে সে কাহিনি সার্থক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাসের স্রষ্টা ও প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে আবির্ভূত হলেন। তাঁকে ঘিরে বাংলা কথাসাহিত্যে নামজাদা সব ঔপন্যাসিকের জন্ম হলো। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে অবস্থান করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই বেশিরভাগ উপন্যাসে ইতিহাসে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে আরও অন্যান্য ঔপন্যাসিকের কলমেও ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস লেখার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতায় ভাঁটা পড়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় থেকে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই বলা যায়—

> ''প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে পরবর্তী প্রায় অর্ধশতক বাংলা উপন্যাসের চালচিত্রে অতীত ইতিহাসের ছবি অস্পষ্ট। কারণ ছিল অনেক, সমকালীন বাস্তবতার সংকট ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই।''[২]

ফলে বাংলা তথা ভারতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব জীবনের ধারা বদলে দিয়েছিল, পরিবর্তিত হয়েছিল সমাজ ও জীবন। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, এর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ইতিহাসে এমন অস্থিরতার সময়ে গোটা বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫), বিশেষত কলকাতা শহরে পড়েছিল এর করাল প্রভাব। সমরায়োজনের মঞ্চ হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কলকাতাকে। এইসময় কলকাতা তথা ভারতবর্ষের যুগান্তরের কাল। একদিকে ধ্বংস ও অন্যদিকে সংগ্রামের শপথ নিয়ে দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এরই সঙ্গে ফ্যাসিবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠলো বিশ্বের সাথে বাংলার, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, যার প্রভাব জীবনের বহুমাত্রায় পড়েছিল, এরই সঙ্গে ঘটে গেল নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, আগষ্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীনতা প্রাপ্তি—এসবের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে পথ চলতে হয়েছে নানা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে।

দেশে ঘটে যাওয়া এত বিপর্যয়, যা জীবনধারাকে একেবারে পালটে দিয়েছিল। সাহিত্যের নানাধারায় ও বাস্তবতার নানা চিত্রে তা প্রতিফলিত হতে লাগলো। বিশেষতঃ উপন্যাসে বাস্তবতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়লো। ঔপন্যাসিকেরা কঠোর কঠিন করুণ পরিস্থিতিকে উপন্যাসে স্থান দিলেন।

> ''এই পর্বের সময়ের গতি দ্রুত, পরিবেশ অস্থির ও নিয়ত পরিবর্তিত, চারদিকে ধ্বংস আর অবক্ষয়ের পাশাপাশি সংগ্রামের শপথ আর নবজীবনের স্বপ্নবাণী উচ্চারিত। বারুদের গন্ধ, ফ্যানের গন্ধ, মড়ার গন্ধ, রক্তের গন্ধ—যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ঃ এর মধ্যে পা ফেলে এগিয়ে চলেছেন এই তরুণ উপন্যাস লেখকরা।''[৩]

ফলে এই সময়ের বিপর্যয় ও অবক্ষয়ে ক্ষত বিক্ষত জীবন থেকে সাহিত্যিকরা সৃষ্টির নানা রসদ খুঁজে পেয়েছেন। তাই এই

সময়ে অতীতের দিকে তাকানোর অবসর ছিল না। চোখের সামনে সে ভাঙন দেখেছেন, তাতেই লিপ্ত থেকেছেন। এরই সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনেও নানা ঘাত-প্রতিঘাত লক্ষ্য করা গেছে, তাও উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই সময়ের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন, তাঁরা হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ। ফলে তাঁদের কাহিনিতে ধরা পড়েছে মূল্যবোধের বিসর্জন, জীবনের অস্থিরতা, দেশভাগ, স্বাধীনতা পেয়েও তা খুশি মনে মেনে না নেওয়া। আর এসব বিষয় ঔপন্যাসিকদের ভাবিয়ে তুলেছে, যা রাগ ক্ষোভ হয়ে ফেটে পড়েছে তাঁদের লেখাতে। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত বিশেষ এক বিপর্যয়ের কাল মনে করা হয়।

তবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের বন্ধনমুক্তি ঘটেছে দেশের বর্তমান সময়ের পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে। পুনরায় উপন্যাসের আঙ্গিকে ইতিহাসের বিষয় ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কারণ এই সময়ে পরাধীনতার গ্লানি নেই, স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হওয়ার কোন আন্দোলন নেই। তাই কাহিনিকার পুনরায় বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই সুদূর অতীত ও নিকটবর্তী অতীতকে আধুনিক জনজীবনের মধ্যে টেনে এনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ণতা ও অপূর্ণতাকে বিচারকের দায়িত্ব নিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের ভাবনাও বদল ঘটেছে। কারণ তখন ঔপন্যাসিকরা সরাসরি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছেন না। লিখছেন ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস (Historical Fiction) অর্থাৎ কাহিনিতে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিষয় বিশেষভাবে বিচার্য হয়ে উঠছে। অতীতের কাহিনি বর্তমানের পটভূমিতে এনে তুলনার নিরিখে দেখেছেন। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য কথাকাররা হলেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' ও 'একাল' বলতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কে বোঝাতে চাইছি, এই দুই পর্বের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনায় বিশেষ কতগুলি পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। যা দিয়ে দুই পর্বের উপন্যাসের যথাযথ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে। 'সেকাল' বলতে বঙ্কিমের লেখা ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাস দিয়ে শুরু করে স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে। 'সেকাল' পর্বের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তা সূত্রাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' :

বাংলা উপন্যাসের সার্থক স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁরই হাতে ইতিহাসকেন্দ্রিক উপন্যাসের জন্ম। বঙ্কিমের উপন্যাসের ধারাকে গ্রহণ করে 'সেকালে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের জয়-জয়কার। এই পর্বের উপন্যাসে সুদূর অতীতের বৌদ্ধযুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে উনিশ শতকের ঐতিহাসিক পটভূমি এই সময়ের উপন্যাসে ধরা পড়ে। উপন্যাসে সেই সময়ের যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ, জীবন ও সমাজ কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তা দেখানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপন্যাসিকদের। এরই পাশাপাশি উপন্যাস রচনার সময়কালে তার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব কতখানি তাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ফলে 'সেকালে' রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে বিশ্লেষণ করলে সমকালীন সমাজ তথা জীবনের নানা তথ্য উঠে আসে।

প্রথমতঃ উনিশ শতকের নবজাগরণ দেশ ও জাতির কাছে যে আধুনিকতা নিয়ে এসেছিল তা সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল সমাজের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত মহল। ফলে এই সময়ে ভারতীয়দের ইতিহাস জানার জন্য এক গভীর টান অনুভূত হয়, কারণ এই সময়ে বিদেশীদের হাতে ভারতীয় ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। কিন্তু এই ইতিহাসের প্রতি ভারতীয়দের ছিল প্রবল অনাস্থা। সে কারণে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে ও ইতিহাস লেখার প্রতি এক তীব্র অনুরাগ জন্মেছিল। আর এই কাজে সামিল হয়েছিলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁর রচিত উপন্যাসে ইতিহাসবোধের নানা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এমনকি

ইতিহাস লেখার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, সে প্রসঙ্গে বলা যায়—

> ‘‘বাঙালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তা ইতিহাস নয়। তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী, বিধর্ম্মী অসার পীড়করের জীবনচরিত্র মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।’’[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাবনা থেকেই ইতিহাস লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন, সে কারণে উপন্যাসের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশোদ্ধারের মত নানা প্রসঙ্গ এনেছিলেন। বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসটি এ সময়ে বাঙালির মনে বিশেষ জাগরণ এনে দিয়েছিল, যেখানে দেশের প্রতি গভীর টান প্রকাশ অনুভূত হয়—

> ‘‘আনন্দমঠ আধুনিক বাংলার জন্মদান করিয়াছে, আধুনিক বাঙালির হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠন করিয়াছে। যে দেশাত্ববোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির সাধারণ মানব সম্পত্তি বঙ্কিমই তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপন করিয়াছেন, ইউরোপের দেশপ্রীতি, বাঙালির বিশেষ অবস্থার মধ্যে বাঙালির বিশেষ পূজাপোকরণের সাহায্যে বাঙালির হৃদয়ের ভক্তি চন্দন চর্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।’’[৫]

আবার ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসে রাজসিংহকে গৌরবময় ভারতের সুমহান দায়িত্বশীল চরিত্র হিসাবে অঙ্কন করা হয়েছে। উনিশ শতকে হিন্দু জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে যে বল ও শক্তিসত্তার প্রয়োজন ছিল তা রাজসিংহের মধ্য দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘‘এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন ছিল না। .... ইংরেজ সাম্রাজ্যের হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনো লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবল আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ স্বরূপ রাজসিংহকে লইয়াছি।’’[৬]

রাজসিংহ চরিত্রকে উপন্যাসে দেশপ্রেমের ভাবনায় দেশকে রক্ষা করার তাগিদে হিন্দুজাতির প্রতিভূ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এছাড়া রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত’ উপন্যাসে, শিবাজীকে আদর্শ চরিত্র মনে করে হিন্দুজাতির জাগরণের কথা পরিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ এই সময়ের উপন্যাসে জাতীয়তাবোধের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

> ‘‘নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক ইতিহাসকে খণ্ডন করে প্রাচীন ভারতে এক সুবর্ণযুগের অস্তিত্বের উপর আস্থা স্থাপন। ফলে ভারতীয় সভ্যতার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন কাহিনির অবতারণা করার প্রচলন হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রাক্ ব্রিটিশ যুগের বিদেশী আক্রমণকারী ও শাসকের বিরুদ্ধে স্বজাতীয় সেনার কল্পিত বা প্রকৃত প্রতিরোধ আন্দোলনের পরাক্রম পাঠকের গোচরে আনা।’’[৭]

অর্থাৎ উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনির মধ্যে উক্ত বিষয়গুলি প্রতিস্থাপন করা ‘সেকাল’ এর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের বিশেষ দিক। ফলে অতীতাশ্রয়ী কাহিনিগুলি পাঠক, সমালোচক ও সাধারণ মানুষের কাছে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিল। অতীতের পুনর্গঠন ও ইতিহাসের তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পথকে প্রশস্ত করার জন্য এই সময়ের উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল সে সময়ে অবশ্যই বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের আরও একটি বিশেষ দিক হলো ‘সিপাই বিদ্রোহ’কে কেন্দ্র করে লেখা বেশ কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, কারণ সিপাই বিদ্রোহ (১৮৫৭) ইংরেজদের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি ও বণিক বুদ্ধিতে নাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশরা যখন পরাধীন ভারতে শোষণের মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তখন ভারতীয়দের সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল, ফলে ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জমা হচ্ছিল। পরবর্তীতে সিপাই বিদ্রোহের মধ্যে যে ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল। সে কারণে বিদ্রোহের ভালো মন্দের বিচার করার অভিপ্রায়ে এই সময়ে

মহাবিদ্রোহ কেন্দ্রিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। ঔপন্যাসিকেরা সংকটের কালে চিন্তাশীল ভারতীয়দের উদ্বেগকে দূর করতে চেয়েছিল এই শ্রেণির উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। তবে একথা বলতে হয় পরাধীন ভারতে অবস্থান করে ব্রিটিশ সরকারকে উপেক্ষা করে এই শ্রেণির উপন্যাস লেখা অতি সাহসিকতার পরিচয় বলে মনে হয়। আসলে ঔপন্যাসিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল—

> ''ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে বসে শত প্রতিকূলতার মধ্যে স্বদেশবাসীর কাছে সিপাহী যুদ্ধের বীরদের বীরত্ব গাথা শুনিয়ে স্বদেশ প্রেমে জাতিকে জাগাতে চেয়েছেন। এ কাজ যে অত্যন্ত কঠিন তা তাঁদের রচিত উপন্যাসগুলি পড়লে মনে হয়।''[৮]

এই যুগান্তকারী মহাবিদ্রোহ বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে 'সিপাই বিদ্রোহ' স্থান পায়নি। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের লেখায় তা বিশেষমাত্রা পেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ সেনের 'ঝাঁসীর রানী', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিজয়', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমরসিংহ' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয়তঃ সেকালের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার আরও একটি মূল উদ্দেশ্য হল স্বদেশপ্রেম। এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের মানুষেরা দেশের সেবায় নিয়োজিত হয়েছিল। অতীতের গৌরবময় কাহিনির মাধ্যমে জীবনের অনেক দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ লুকিয়ে আছে। বিশেষত 'গুপ্তযুগের' কথা বলতেই হয়, সেকালের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক গৌরবের প্রসঙ্গ তুলে এনে লেখকেরা পরাধীন ভারতীয়দের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষ যে বারবার বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তা থেকে মুক্তি পেয়েছে দেশপ্রেমের মাধ্যমেই, এ ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিতেও লেখকেরাই ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছেন। উনিশ শতকে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির কাছে এর পরিবেশন অত্যন্ত জরুরি। উপন্যাস পাঠের দীক্ষায় স্বদেশপ্রেমকে মূলমন্ত্র করে প্রতিবাদের নানা অভিমুখ তৈরি হয়েছে। স্বদেশপ্রেমকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন ভারতের আপামর জনগণ। এ প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রসঙ্গ আনতে হয়। 'আনন্দমঠে' বিপ্লবী দল দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে স্বদেশপ্রেমের বাণী উচ্চারণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই আদর্শের কথা এনে 'সন্তানদলের' কথা বলেছেন। এতে মনে হয় ভবিষ্যতে এদের দ্বারাই দেশরক্ষা হবে। সমালোচকের এ মন্তব্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য—

> ''বিশ শতকের প্রারম্ভে যে সব বিপ্লবী দল দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন, তাদের দক্ষিণ হাতে থাকত গীতা, বাম হাতে 'আনন্দমঠ'।''[৯]

'রাজসিংহ' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের বার্তা দিয়েছেন। এই উপন্যাসের নায়ক হয়ে মোঘলদের হাত থেকে দেশরক্ষার প্রসঙ্গকে তুলে ধরে। উনিশ শতকে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের মধ্য দিয়ে দেশরক্ষা ও স্বদেশপ্রেমের কথা শুনিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। আসলে এই পর্বের উপন্যাসে উনিশ শতকের জাতীয়তা বোধের পরিচয়কে তুলে ধরাই ঔপন্যাসিকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

চতুর্থতঃ এই পর্বের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের আরও একটি বিশেষ দিক হলো ঐতিহাসিক বীরচরিত্র অন্বেষণ। বীর চরিত্রের বীরত্ব অন্বেষণ উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি ছিল। যাতে পরাধীন ভারতে বীর দেশপ্রেমিকরা অতীতের বীর চরিত্রের আদর্শকে গ্রহণ করে দেশের কাব্যে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তাঁর উপন্যাসে 'বীরচরিত্র' অন্বেষণের কাজ শুরু করেন। 'সীতারাম' ও 'রাজসিংহ' চরিত্রকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনেন। 'সীতারাম' বাংলার শেষ স্বাধীন নরপতি, যিনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত। এই চরিত্রকে তুলে ধরার মূল কারণ সীতারামের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালির দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখানো। অন্যদিকে রাজসিংহের প্রবল বুদ্ধিমত্তা যার মাধ্যমে মোঘলদের হাত থেকে রাজপুতদের রক্ষা করা। এই দিকটি তুলে ধরাই উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া উনিশ শতকে রাজসিংহের মতো সৎ, দৃঢ়, মনোবলে সমৃদ্ধ চরিত্রের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

এই পর্বের অন্যান্য উপন্যাসেও এরকম অনেক বীর চরিত্রের সন্ধান মেলে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমেশচন্দ্র দত্তের 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' উপন্যাসে 'শিবাজী' চরিত্র, 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় প্রতাপসিংহ চরিত্র, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ফুলের মালা' উপন্যাসে গণেশ চরিত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক' উপন্যাসে শশাঙ্ক চরিত্র, 'ধর্মপাল' উপন্যাসের ধর্মপাল চরিত্র, চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজা নন্দকুমার' উপন্যাসের নন্দকুমার চরিত্র প্রভৃতি বীর চরিত্রের সন্ধান মেলে। এছাড়াও অন্যান্য অনৈতিহাসিক বীর চরিত্র ইতিহাসের ছায়াতলে বিচরণ করতে করতে তারাও 'বীরচরিত্র' হিসাবে ধরা দিয়েছে। এর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের 'নবকুমার' চরিত্র ও 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রতাপ চরিত্রকে মনে করা যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ এই পর্বের উপন্যাসে নারী জাগরণের সুরও ধ্বনিত হয়েছে। নবজাগরণের সূত্র ধরে উনিশ শতকে নারীমুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসে নারী জাগরণের নানা বিষয় উত্থাপন করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে মুক্তিপ্রার্থী অনেক নারীর সন্ধান মেলে। যেমন মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা, শ্যামাসুন্দরী নূরজাহান প্রমুখেরা। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে কাঞ্চনমালা বীরাঙ্গনা নারী হিসাবে দীক্ষিত। উনিশ শতকের পটভূমিতে প্রথম নারীর প্রয়োজন ছিল। এদিক থেকে বলা যায়—

> ''সে যুগে ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক ও সমাজ সংশোধক সবাই এই অনুক্ত বিশ্বাসে একমত ছিলেন যে নারী পরম্পরাগত সংস্কৃতির ধারক ও পোষক, বহিরাগত শক্তি প্রাবল্যে যাতে প্রাচীন সভ্যতার ক্ষয় না হয় তা অতন্ত্র প্রহরী।''[১০]

অতএব এই সময়ের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি না হলেও তাদের মুক্তির পথ তৈরি হতে পেরেছে সেটাই কম কি। তাই বলা যায় জাতীয়তাবাদের উত্থানে নারীর জাগরণ এই পর্বের উপন্যাসের বিশেষ লক্ষণ।

ষষ্ঠতঃ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের 'সেকাল' এই পর্বে ঔপন্যাসিকদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিকের কথা বলা যায়, লেখকেরা ইতিহাস রচনা করার উদ্দেশ্যে উপন্যাস লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন। উনিশ শতকে ইতিহাস লেখা বা চর্চা করার এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছিল। কারণ বিদেশীদের লেখা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রসঙ্গ। ভারতীয়দের তা পছন্দ হয়নি, সেই অভিপ্রায়ে ইতিহাস চর্চার প্রতি আলাদা এক উন্মাদনা তৈরি হয়। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ইতিহাসবুভুক্ষার' কারণে জাতির আত্মসম্মান বোধের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের সাহিত্যে ও ইতিহাসের ব্যবহার বিশেষ মাত্রা পায়। সেদিক থেকে উপন্যাসেও ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন একটি মুখ্য দিক বলে মনে হয়। আর এই ইতিহাসের ব্যবহারকে সার্থকতায় পর্যবসিত করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি একাধারে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পথিকৃৎ ও ইতিহাস রচয়িতা। বঙ্কিমের এই আদর্শকে মান্যতা দিতে এই পর্বে দেখা মেলে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্য অবশ্যই গ্রহণীয়—

> ''এই বিশেষ কারণে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের অসাধারণ মূল্য, বিগত শতাব্দের বাংলা ঐতিহাসিক যুদ্ধ বর্ণনায় আড়ম্বর রাজৈশ্বর্যের সমারোহ ও রাজবিরোধের রহস্য ঘনিময় তখনকার পাঠকচিত্তকে অভিভূত করতো।''[১০]

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের 'একাল' :

সাহিত্যের সব ধারাকেই শিল্পগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেশকালের একটা বড়ো প্রভাব থাকে। আর এই দেশকালকে জানতে অতীত ইতিহাসের কাছে যাওয়া সাহিত্যিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে অর্ধশতক পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ববর্তী কালে বাংলা উপন্যাসে 'ইতিহাসের বিষয় ও কাহিনি' বিশেষ জায়গা দখল করেছিল। স্বাধীনতার পরবর্তী উপন্যাসেও ইতিহাসে বিষয় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু উপন্যাসে তার প্রয়োগ অন্যমাত্রায় বিভূষিত হয়েছে। অর্থাৎ 'একাল' এই পর্বে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচিত হয়েছে স্বাধীন ভারতের পরিবেশ পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে। কারণ এই পর্বে স্বাধীনতা পাওয়ার যেমন আনন্দ ছিল, তেমনি জীবনকে নতুন ভাবে দেখারও বিশেষ অনুভূতি ছিল।

তাই এই পর্বের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের ছত্রছাড়া থাকলেও ঔপন্যাসিকেরা অতীতকে বাস্তবের পটভূমিতে এনে তুলনার বিচারে তা দেখাতে চেয়েছেন। লেখকদের এই ইতিহাসবোধ কেন গড়ে উঠলো তারও নানা দিক আছে, তা অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে—

> ''মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয় স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।''[১১]

এই খাঁটি ইতিহাসের সন্ধানে এই পর্বের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে অতীত উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে মানুষের মনের ইতিহাসই বড়ো, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমাজনীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি। এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করলে স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের যে বিশেষ দিক রয়েছে তা আলোচনার দাবি রাখে—

প্রথমতঃ এই পর্বের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেও সুদূর অতীতের নানা ঘটনার উপর নির্ভর করে উপন্যাস রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকরা হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ। তাঁদের সুদূর অতীত নিয়ে উপন্যাস লেখার কারণ, ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও লুপ্ত গৌরবের সুবর্ণময় অতীতকে পুনরায় মনে করা। তাই গুপ্তযুগের সুবর্ণময় ইতিহাস তাঁদের উপন্যাসে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—

> ''গুপ্তদের শাসনকালকে প্রাচীন ভারতের 'ক্ল্যাসিক্যাল যুগ' বলে বর্ণনা করা হয়। সমাজের উচ্চশ্রেণীকে বিচার করলেও এ মন্তব্যে কোন ভুল নেই। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ঐ যুগে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি উপভোগ করেছিল। বিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই সম্পর্কে লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিকদের কাছে সুদূর অতীতের গুপ্তযুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে মনে হয়েছে। এই যুগেই হিন্দু সংস্কৃতি ভারতবর্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।''[১২]

স্বাধীনতা প্রাপ্তি ভারতবাসীর কাছে একদিকে যেমন আনন্দের, তেমনি তাকে রক্ষা করার দায়ও দেশবাসীর। তাই সুদূর অতীতকে পুনরায় স্মরণ করে দেশকে রক্ষা করার কথা ধ্বনিত হয়েছে গুপ্তযুগের আলোচনার প্রসঙ্গ এনে। হূণদের আক্রমণ থেকে গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষা করার যে সংগ্রামী মনোভাব, তা স্বাধীনতার পরও এই অভিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। স্বয়ং শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে এ ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়—

> ''আমি আমার গল্পে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধরবার চেষ্টা করিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এইগুলিই আমার শ্রেষ্ঠ রচনা। শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক, আমি বাঙালীকে তাহার প্রাচীন এর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ চেষ্টা আর কেহ করে না কেন? বাঙালী যতদিন না নিজের বংশ গরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না; ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।''[১৩]

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার পরবর্তীতে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসগুলি 'সিপাই বিদ্রোহের' প্রেক্ষাপটে লেখা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যায় স্বাধীনতার পরের দশকই সিপাহি বিদ্রোহের একশ বছর পূর্তির কাল। ফলে এই পটভূমিতে 'সিপাহি বিদ্রোহ' যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন তা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা। তাছাড়া এই বিদ্রোহের আদর্শ ও গুরুত্বকে স্বীকার করা। এছাড়াও বলা যায় 'সিপাহি বিদ্রোহ' চলাকালীন ঔপন্যাসিকরা পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতা করতে ভীত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর এই বিদ্রোহকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখতে আর পিছুপা হননি। ফলে লেখকেরা বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ কি ছিল, কার ভূমিকা কতখানি তা বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে সিপাহি বিদ্রোহের অন্দরে যে অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক বৈষম্য, সামরিক অসন্তোষ ছিল তা ঔপন্যাসিকেরা যথাযথ বর্ণনা করেছেন। এই সময়ে লিখিত উপন্যাসগুলি, মহাশ্বেতা দেবীর 'অমৃত সঞ্চয়', 'নটী', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা', প্রমথনাথ বিশীর 'লালকেল্লা' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

তৃতীয়তঃ স্বাধীনতা পরবর্তীতে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস সৃজনে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, পুনরায় ইতিহাস চেতনাবোধ জাগ্রত করা। কারণ এই সময়ে দেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। তাই এই পর্বের ঔপন্যাসিকেরা অতীতের ইতিহাসকে দিন বদলের পালা ও জীবনবোধের ধারণা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তাই প্রথাবদ্ধ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস না হয়ে ইতিহাসের পটভূমিতে প্রতীকি রূপে দেখানো হয়েছে। ইতিহাসের অর্থবহ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনার প্রতিষ্ঠা দেওয়া এই পর্বের উপন্যাসের বিশেষ দিক বলে মনে হয়। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হলো, মহাশ্বেতা দেবীর ‘বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু’, ‘আঁধারমানিক’, তারাশঙ্করের ‘রাধা’ প্রভৃতি। মহাশ্বেতা দেবীর মন্তব্যে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> ‘‘ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া।’’[১৪]

এই অর্থপূর্ণ দিককে অন্বেষণ করাই ছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের মূল বক্তব্য।

চতুর্থতঃ স্বাধীনতার পর জীবনের ধারা অনেকখানি বদলেছে। এই সময় স্বাধীনতার প্রাপ্তি যেমন আনন্দের তেমনি অপ্রাপ্তির পারদও বেড়ে চলছিল। ফলে এইসময় মাথাচাড়া দিয়েছিল বাস্তব কিছু সমস্যা, যেমন কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, নগরে বন্দরে কারখানার উৎপাদনে মার খাওয়া, জীবনে অভাব-অনটন নেমে আসা। যে কারণে জীবন থেকে মূল্যবোধ হারিয়ে যাচ্ছিল, নৈতিকতা বিসর্জিত হচ্ছিল। এমনই বাস্তব পরিস্থিতিতে সুদূর অতীতকে মনে রেখে একালেও সেই কালের মানবিক বিবেক সমৃদ্ধি মানুষের অন্বেষণ মুখ্য হয়ে উঠলো। যেমন স্বাধীনতার পূর্ববর্তীতে বীর চরিত্রের অন্বেষণ করেছিলেন ঔপন্যাসিকেরা, এ পর্বেও চৈতন্য, বুদ্ধদেব, দারাশুকো, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ চরিত্রের খোঁজ করেছেন ঔপন্যাসিকেরা। এই ধারার উল্লেখযোগ্য ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস হলো, শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘শাহাজাদা দারাশুকো’, বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘প্রথম আলো’, ‘সেইসময়’ প্রভৃতি।

পঞ্চমতঃ স্বাধীনতা পাবার বেশ কিছু বছর পর, ঔপন্যাসিকেরা পুনরায় দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন। এর মূল কারণ যেমন ঔপন্যাসিকেরা এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন, তাদের মন থেকে দেশভাগের যন্ত্রণা। ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে বেঁচে থাকার লড়াই, এ সবের দগদগে ঘা তখনো মুছে যায় নি। তাই দেশভাগের কথা অর্থাৎ নিকটবর্তী অতীতকে নিয়ে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লেখায় অগ্রসর হলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’, ‘অর্জুন’, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়াপাতার নৌকা’ প্রভৃতি। এই সব উপন্যাসে জীবন, চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাসের পটভূমিতে আলোচিত হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকটি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে। নবজাগরণের ফলে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, এই সময়ে সাহিত্যে আধুনিকতার দিক নির্দেশিত হয়েছে, ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে, গদ্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছে, বিজ্ঞান সচেতনতাবোধ গড়ে উঠেছে, ইতিহাস জানার আগ্রহ বেড়েছে। এসবের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। সে কারণে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা উনিশ শতকের ইতিহাস ও সময়কে মনে রেখে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। বিশ শতকে দাঁড়িয়ে উনিশ শতকের বিশ্লেষণ এটা উপন্যাস রচনার বিশেষ দিক বলে মনে হয়। তাছাড়া উনিশ শতকের নবজাগরণ কতখানি সার্থক তারও বিচার নিরুপিত হয়েছে উপন্যাসের অন্দরে। এই সময়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেইসময়’, আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, প্রমথনাথ বিশীর ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’ বিমল মিত্রের ‘সাহেব বিবি গোলাম’ প্রভৃতি। এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস ও সমাজ মিলেমিশে একাকার হয়েছে। এখানে

লেখকেরা ইতিহাস ও সময়ের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে বাস্তব সমাজকে তুলে এনেছেন। স্বাধীনতার পর ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার এ এক অভিনব পন্থা বলে মনে করা যায়।

শেষকথা : ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের ' সেকাল' ও 'একালের' তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, দুটি ধারাতেই ইতিহাসের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। তবুও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সময়কাল নির্দেশিত হয়েছে, তার ফলে দুটি পর্বেই কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আসলে সময়ের সাথে সাথে ইতিহাস বদলেছে, নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছে, অনেক অজানা দিক নতুন করে পরিস্ফুট হয়েছে, ফলে ঔপন্যাসিকেরা সে মাত্রাকে মান্যতা দিয়ে 'সেকাল' ও 'একাল'-এ ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। তবে ঔপন্যাসিকেরা সর্বদাই নিজের ভাবনায় ইতিহাসকে বাস্তব পরিস্থিতি কেন্দ্রিক করে তুলেছেন। দুই পর্বের উপন্যাসে পরিবেশিত ভিন্নধর্মীতার যে দিকগুলি পাওয়া গেল, তা যুগ ও জীবনকে নতুনভাবে ফিরে পাওয়ার এ এক অভিনব প্রয়াস। এরই সূত্র ধরে ভবিষ্যতে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের অন্যান্য ভিন্নধর্মী দিক নির্দেশিত হবে এরূপ আশা করা যায়। সবশেষে বলতে হয়, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের ধারা কখনোই থেমে থাকবে না, নতুন নতুন ভাবনায় নানা অভিমুখ তৈরি হবে, যা পরবর্তীতে আলোচনার নতুন দিক উন্মোচিত করবে।

সূত্রনির্দেশ

১. মহাশ্বেতা দেবী, বিনীত নিবেদন, আঁধারমানিক, সাহিত্যম্, পৃ. ৩।
২. সুমিতা চক্রবর্তী, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, পৃ. ১২৮।
৩. অরুণ মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, দে'জ, পৃ. ১৫১।
৪. যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড), পৃ. ২৯১।
৫. শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী, পৃ. ৫২।
৬. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ও কল্প ইতিহাস, কলকাতা, পৃ. ১৫।
৭. সুমিতা চক্রবর্তী, বাংলা উপন্যাসে মহাবিদ্রোহ, বইমেলা বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ১৭১।
৮. প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সরণী, পৃ. ১৭১।
৯. মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, উপন্যাসে অতীত ও কল্প ইতিহাস, পৃ. ৭৩।
১০. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, বঙ্কিম রচনাবলী, বাঙ্গালার কলঙ্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতির রেখা, বিভূতিভূষণ রচনাবলী, পৃ. ৩৬০।
১২. রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃ. ১০০।
১৩. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনকণিকা, শরদিন্দু অমনিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।
১৪. মহাশ্বেতা দেবী, লেখকের কথা, কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু, দ্বিতীয় সংস্করণ।

লিপিকা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

সময়ের স্বর ও মেঘে ঢাকা তারা : প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বিচিত্রিত নিরিখে

রত্না সাহা

১৯৪৭ সাল। কালনেমির অভিশাপ নিয়ে ভাগ হল ভারত। জন্ম নিলো পাকিস্তান। তার দুটি ভাগ—পূর্ব ও পশ্চিম। ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের যাওয়া-আসা দুই প্রান্তেই। দুর্দশা প্রকট হলো পশ্চিমবঙ্গে। ঝোপ-ঝাড় কেটে, জলাজমি ভরাট করে বাসা গড়া। সব হারিয়ে চোখের জলে তাঁবু, টিনের ছাপড়ার মধ্যে নিশিযাপন। চারিদিকে শুধু অভাব-অনটন, দুঃখ-হতাশা, কর্মহীনতা, অনাহার আর আর্তনাদ। এইরকম সময়ের 'সুখমুখর পীরগঞ্জের সেই দিনগুলো' হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে আসা এক দরিদ্র মুখার্জী পরিবারের বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই এবং মূল্যবোধে মরচে পড়ার কাহিনি 'মেঘে ঢাকা তারা'। যে কাহিনির আড়ালে রয়েছে গোটা উদ্বাস্তু সমাজের ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ আর যন্ত্রণা-বেদনার ইতিবৃত্ত। সেখানে কাঁচা-ইট বিছানো কলোনির রাস্তায় হোঁচট খেয়ে চপ্পল ছিঁড়ে যায়। তবু নিরন্তর সেই সংগ্রামে তারা হারে না, হয়তো একটি প্রাণের বিনিময়ে একটি পরিবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

প্রাসঙ্গিক গল্পটি হিন্দি, মালয়ালম ও ইংরেজি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলায় চিত্রায়িত হয় 'মেঘে ঢাকা তারা' নামে। হলফ করে বলা যায় এ-যাবৎ নির্মিত শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবিগুলির প্রথম দশটির মধ্যে 'চেনামুখ' বা 'মেঘে ঢাকা তারা' স্থান পাবে। সিনেমাপ্রিয় আপামর বাঙালির সিনেমাটি নিশ্চয়ই দেখা। হয়তো বা একাধিকবার। অনেকের প্রিয়ও বটে। সিনেমাটির পরিচালক স্বনামধন্য ঋত্বিক ঘটক। কাহিনিকার শক্তিপদ রাজগুরু অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের 'মেঘে ঢাকা তারা'র প্রশংসনীয় সাহিত্যিক-চিত্রনাট্যকার।

কাহিনির মূল চরিত্র নীতা। পরিবারের বড়ো মেয়ে। তাকে কেন্দ্র করে কাহিনির উত্তরণ, অন্য চরিত্রগুলির আবর্তন। নীতার বাবা মাধববাবু পূর্ববঙ্গে জমিদার বা তেমন উচ্চশিক্ষিত-বিশিষ্ট কেউ ছিলেন না। এফ.এ. পাশ স্থানীয় স্কুল-শিক্ষক। মোটামুটি সম্পন্ন পরিবার। ছিন্নমূল হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে জবরদখল কলোনিতে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেন, সঙ্গে স্ত্রী ও চারটি সন্তান। কলোনিতে উদ্বাস্তু জনেরা মিলে স্কুল পত্তন করে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিন্তু চারটি সন্তানের শিক্ষা আর ছয়টি মুখে খাবার জোটানো প্রচণ্ড কষ্টকর হয়ে ওঠে। অভাব আর অনটনের নগ্নছায়া তার সংসারের সর্বত্র। মাধব মাস্টারের বেহিসেবি মন জীবনের প্রান্তে এসে ভাঙ্গা হিসেবের টুকরো জোড়বার বৃথা স্বপ্ন দেখে। সারা জীবনটাই তিনি অপচয় করে এসেছেন, কাটিয়েছেন পরের ছেলেকে মানুষ করে। কিন্তু বুকই পুড়েছে প্রদীপের চারদিকে আলো বিকীর্ণ করে, নিজের জড় দেহটার পা বেয়ে গড়িয়ে পড়েনি প্রদীপের তেজ—পিলসুজের নীচের মতো অন্ধকার কোনও দিনই ঘোচেনি। মেয়ে নীতা বাবার পাশে দাঁড়ায়, কলেজে পড়তে পড়তে চাকরিতে ঢোকে, তাতেও কুলায় না। তার দায়িত্ব অনেক—সঙ্গীত শিক্ষার্থী দাদা শঙ্করের হাত খরচ জোগানো, ছোট ভাই-বোনের আবদার মেটানো, বাবার প্রিয় ছাত্র সনৎ-এর উচ্চশিক্ষার খরচ জোগানো, এসব কি আর সামান্য চাকরির টাকায় কুলোয়? এদিকে বাবাকেও একদিন কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। তখন শিক্ষকের পেনশন প্রথা চালু হয়নি। সংসারের সব দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে হয় নীতাকে। তাই সে ট্যুইশনিও শুরু করে। সময়ের অভাবে কলেজ ছেড়ে দিয়ে শুরু হয় প্রাইভেটে পড়া। সবার দিকে তার দৃষ্টি। এমনকি অবসরপ্রাপ্ত বাবা যাতে নিজেকে সংসারে অপ্রয়োজনীয় বোধ না করেন, সে কারণে বাবাকে দিয়ে স্কুল-পাঠ্য বই লেখায়, প্রকাশক জোগাড় করে বাবাকে বেঁচে থাকার অবলম্বন জোগায়। কিন্তু তার দিকে দৃষ্টি দেবার কেউ নেই। নীতা 'মনের গভীর দুঃখকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চায়।' তবু সে পাহাড় ভালবাসে, ভালবাসে সনৎকে। সনৎ তার কাছে 'নিবিড় আঁধারের মধ্যে একটু ম্লান শিখা, দূর আকাশের তারার মত ঝিকিমিকি তোলে আশার আনন্দে।'[১] তার কথা মনে করলে

সাহা, রত্না : সময়ের স্বর ও মেঘে ঢাকা তারা : প্রত্যাশা-প্রাপ্তির বিচিত্রিত নিরিখে
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 42-47, ISSN 2249-4332

নীতার দুঃখ-গ্লানি হালকা হয়ে যায়। নীতা স্বপ্ন দেখে, আশায় বুক বাঁধে ছোটো ভাইটি চাকরি পাবে, দাদা সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, সনৎ পি.এইচ-ডি করে বড়ো অধ্যাপক হবে এবং নীতাকে তার জীবনে মিশিয়ে নেবে।

ছোটো ভাই মন্টু একদিন খেলার সুবাদে চাকরি পায়। দাদা শঙ্করও সামান্য কিছু রোজগার শুরু করে। সনৎ এম. এ. পাশ করে চাকরিও পায়। কিন্তু নীতার জীবনে সুখ অধরাই থেকে যায়। নীতার বোন গীতা স্বার্থপর, লোলুপ, সুযোগ সন্ধানী। দিদির ট্যুইশনির টাকায় সে শাড়ি আদায় করে নেয়। সে জানে দিদির প্রেমিক সনৎ-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সনৎকে রূপে ভোলায়। মা কাদম্বিনীর এতে সায় থাকে। দিদির ভালোবাসাকে গীতা দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যায়। সনৎও উচ্চশিক্ষা, কেরিয়ার ভুলে সস্তার কেরানিগিরির চাকরি নেয়। নীতার ভালোবাসা এড়িয়ে রূপের হাতছানিতে ধরা দেয় (আজও আমরা দেখি বিয়ের বাজারে ফর্সা, সুশ্রী মেয়েই পাত্রপক্ষের প্রথম পছন্দ)। সনৎকে ঘিরে থাকা নীতার স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এক লহমায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নীতার জন্য নীরবে বেদনাবোধ করে শঙ্কর। নীতার দিকে চেয়ে স্থির কণ্ঠে শঙ্কর বলে ওঠে, 'ঠকে গেলি নীতা! আমি লোক চিনি রে। বলেছিলাম না ওই সনৎ একটা ঠগ। ভুষিমাল। তুই ভাবতিস ও বিরাট একটা কিছু হবে, পি-আর.এস, পি.এইচ-ডি, নাম করা কোন অধ্যাপক, গবেষক যা হোক একটা কিছু না? কিন্তু মাটি কখনও সোনা হয় না রে! রূপ দেখেই মজে গেল নেশায়। ননসেন্স।'[২] বড়ো আঘাত পায় নীতা। আঘাত পায় মা কাদম্বিনীর নির্লজ্জ স্বার্থপরতায়ও। গীতার বিয়ের সময় মন্টুর কাছে টাকা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। নীতা যেন এইবার বুঝতে শুরু করে 'ইচ্ছে করেই ওরা সকলেই যে তাকে এমনি করে নিংড়ে নিচ্ছে, নিদারুণ ভাবে ঠকাচ্ছে তিলে তিলে এই সত্যটা বুঝতে তার দেরী হয় না'[৩]। নীতার অর্থকারী সমস্যার সমাধান মা করে দেন, 'হ্যাঁরে রেলপারের দত্তমশাই একটা ট্যুইশনির কথা বলেছিলেন ওঁর মেয়ের জন্য; তিরিশ টাকা দেবেন বলেছিলেন'[৪]। নীতা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কঠিন দৃষ্টিতে; টাকা রোজগার করবার জন্যই যেন পুষে রেখেছে তাকে।

বাড়ির স্বার্থপর পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসে শঙ্করের। চোখের সামনে দেখেছে সে নীতার জীবনের এই নিদারুণ যন্ত্রণা। তবু সে অবাক হয়, অবাক হয় নীতার সহ্যশক্তিতে। নীতাও 'অন্ততঃ একটি লোকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যার সাধনশুদ্ধ চিত্তের সামনে ফাঁকি দেবার সামর্থ্য তার নেই'[৫]। শঙ্কর নীতাকে বলে ওঠে, 'দুঃখকে ভয় করিস বলেই এতটুকু আনন্দকে কাঙালের মত আঁকড়ে ধরে তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চাস। কিন্তু দুঃখকে জয় করবার এ পথ নয় রে। নিজের কাছে পদে পদে যে হার মানবি—দুঃখ তাতে বাড়বে বই কমবে না। দুঃখের মধ্যে যে মঙ্গল আসে—সেই প্রকৃত আশীর্বাদ নীতা। তারই মাঝে পাবি সান্ত্বনা—পথ খুঁজে পাবি মুক্তির। দুঃখকে এড়িয়ে নয়—তাকে জয় করেই খুঁজে নিতে হবে সেই পথ'[৬]। পথ খুঁজে নেয় নীতা। সে যেন স্বপ্ন দেখছে—'আকাশছোঁড়া সেই পর্বতসীমা। দূরে মেঘ-রোদ-ছায়া—পাইনের সবুজ বনে ঝড় উঠেছে—আকাশমাতানো ঝড়; তারই মাঝে কি যেন একটা সুর এগিয়ে আসে। সারা দেহে জাগে রোমাঞ্চ, প্রতি লোমকূপ সজাগ হয়ে ওঠে'[৭]। গীতার বিয়ের দিন শঙ্কর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। নীতাকে বলে যায়—'এত বড় অন্যায়টা তুই মেনে নিতে পারিস, আমি সহ্য করবো না। এ বাড়ির আমি তো ফালতু—এলে গেলেও কেউ টের পাবে না। তবু আমি এর প্রতিবাদ জানিয়ে গেলাম'[৮]।

ওদিকে অচিরেই সনৎ-গীতার সম্পর্কে চিড় ধরে। মা এবং গীতা নীতাকেই দায়ী করে। আত্মীয়রাও সেই সুরে গলা মেলায়। সনৎ-এর মনে আজ প্রশ্ন জাগে। রূপসী গীতার দিকে চেয়ে সে চুপ করে থাকে। নিজেকে সে কখনোই নীতার ভালবাসার যোগ্য করে তুলতে পারেনি। 'ভীরু সে। নীতার অগ্নিশুদ্ধ প্রেমের যোগ্য করে তুলতে যে সাধনার দরকার, সনৎ সেই পথ থেকে যেদিন ভ্রষ্ট হয়েছে, নীতাও সরে গেছে সেই দিন তার কাছ হবে'[৯]। নিজেকে অক্ষম মনে করে সনৎ। এই অক্ষমতাই আজ তার মনে কাঁটার মতো বাজে নীরব ব্যথায়। এতদিন নীতা নীরবে কৃপা করে এসেছিল তাকে। আজ সেই কৃপা রূপান্তরিত হয়েছে পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা আর অবহেলায়। এ জীবনের পথ সহজ নয়—দুর্গম, বন্ধুর। অনেক জটিলতা মিশে থাকে জীবনের বাঁকে বাঁকে। শান্তিতে চলবার উপায় এখানে নেই। শান্তির স্বপ্ন তাই সনৎ-এর মন থেকে যেন চিরতরে হারিয়ে যেতে থাকে। মরমে মরতে থাকে নীতা। সকলের দৃষ্টি এড়াতে দাদার পরিত্যক্ত বাইরের ঘরে আশ্রয়

নেয়।

জীবনের স্রোত বয়ে চলে। সংসারের চাকা একদিন ঘোরে; পঙ্গু ভাই মন্টু অফিস থেকে পঙ্গুত্বের খেসারত পায়; এককালীন পাওয়া সেই টাকায় দরমার বেড়া দেওয়া টালির ঘর ভেঙে একতলা বাড়ি শুরু হয়। শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে ফিরে আসে, ভালো বাড়ি তৈরি হওয়ার আর আর্থিক বাধা নেই। সকলের অলক্ষ্যে নীতার রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সকলকে ফাঁকি দিতে পারলেও দাদাকে ফাঁকি দিতে পারে না, শঙ্করের কাছে নীতা ধরা পড়ে যায়। শঙ্কর আবিষ্কার করে বোনের যক্ষ্মা। পাহাড়ের কোলে নিয়ে যায় প্রিয় বোনকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করে শিলং-এর এক স্যানিটোরিয়ামে নিয়ে গিয়েও নীতাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। একটি জীবনের ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়া-কলরব; বেঁচে থাকার জন্য আশার-আলোর সংগ্রাম, সব অতল স্তব্ধতায় ডুবে যায়। ধীরে ধীরে সবাই নীতাকে ভুলতে থাকে। নীতা যে তাদের সাফল্যের মূল ভিত্তি ছিল, অকৃতজ্ঞ জগৎ তা মনে রাখে না। মনে রাখে শঙ্কর। বাড়িতে আবার উৎসব। গীতার ছেলের অন্নপ্রাশন। সবাই মেতে উঠেছে, কিন্তু শঙ্কর পারে না। এই তো কাহিনির চুম্বক। লেখকের মুন্সিয়ানা কাহিনি বর্ণনায় শুধু নয়, কাহিনি পরিবেশনায়, চরিত্র চিত্রণে, চলচ্চিত্রে আবহ সৃষ্টিতে, চিত্রকল্প উপহারে, আর এই সব কটি ক্ষেত্রেই শক্তিপদ দারুণ ভাবে সফল।

নীতা কালো মেয়ে। তাই তার জন্যে কোনও রাজপুত্র কোনদিন আসবে না; মাধববাবুও বলেন, 'রূপ নেই, কালো মেয়েকে কে নেবে বল?' তাই বুঝি নীতার 'অন্যপূর্ব'কেই গীতার পাত্র ঠিক করতে মায়ের দ্বিধা হয়নি। তাছাড়া বাস্তব আর একটি সত্যও যে রয়েছে, নীতার বিয়ে হয়ে গেলে সংসার চলবে কি করে? কালো মেয়ের টাকা তো আর কালো নয়। কিন্তু সনৎ? যাকে ট্যুইশনির টাকায় এম.এ পড়িয়েছে নীতা। সেও কি একবার নীতার কথা ভাবলো না? গীতার উচ্ছ্বলতায় মুগ্ধ হয়ে খুঁজে নিল সুখী-নিশ্চিন্ত গৃহকোণ? হ্যাঁ। খুঁজে নিল। কারণ 'বলটা যার—এ দুনিয়ায় সেন্টার ফরোয়ার্ড হতে বাধে না তার। খেলবার যোগ্যতা তার থাক আর নাই থাক'[১০]। গীতাকে কেন্দ্র করে সনৎ তাই নতুন জীবন গড়ে তুলতে চায়; বাঁচার স্বপ্ন দেখে। 'গীতার দেহ ঘিরে প্রথমে যৌবনের জাগরণী সুর, দেহ-মনে ওর শ্যাম উপবনের নিশানা, পাখি ডাকা কোন সুরের রেশ নিয়ে'[১১] সনৎ-এর কাছে এক অমৃতলোকের সন্ধান দিয়ে যায়। তাছাড়া সনৎ অসাধারণ কোনও চরিত্র নয়, আর নীতার জন্য কে জানে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে, ততদিনে হয়তো যৌবন সমুদ্রে ভাটার টান চলে আসবে। সনৎ তাই ভুলে যায়, ভুলতে চায় যে নিঃসঙ্কোচে নীতার ব্যাগ থেকে টাকা তুলে নিতে গিয়ে একদিন সে বলেছিল, 'তোমার টাকা? কত নেব বলতে পারো?'[১২] নীতা সনৎ-এর দিকে তাকায়—'গোধূলির শেষ আলোয় কালো আকাশের বুকে তখনও গাঢ় লাল আবীরের আলপনা; কালো মেয়েটিকেও সুন্দর দেখায়। ওর দুচোখের চাহনিতে নিবিড় একটি আমন্ত্রণ। ওর হাতখানা তুলে নিতে নীতা বলে ওঠে—নেবার মত একটা পরিচয় পাকাপাখি গড়ে তুলো তখন'[১৩]।

সনৎ অবাক হয়ে যায় নীতার দ্বিধাহীন আত্মনিবেদনের সুরে। দীর্ঘ দশ বছর সে নীতাকে দেখেছে। এমন তো আগে কখনও হয়নি। সনৎ-এর মনে হয়—'মেয়েরা বোধহয় এমনই। প্রথমে দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকে, কিন্তু যাকে আপন করে নেয় তারা সেখানে কোন ফাঁক আর ফাঁকি থাকে না। নীতা আজ নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে আসতে পেরেছে'[১৪]। নীতার 'কালো কালো গড়ন, কপালে এসে পড়েছে দু'একগাছি ঘামে ভেজা পাতলা চুল। দুচোখে আবছা আলোর দীপ্তি, পুষ্ট হাতে একগাছি পাতলা কঙ্কণ। নিরাভরণা, কিন্তু মনের শ্রী শুচিতা বুদ্ধির দীপ্তির ওর সব কালো ছাপিয়ে নিটোল কামনার রূপবতী কন্যায় পরিণত করেছে। মাঝে মাঝে এই জনতার মাঝে অতি পরিচিত এই মেয়েটিকে মনে হয় দূরের মানুষ। —নীল আকাশের তারার মতোই অধরা সে'[১৫]। সে যে মেঘে ঢাকা তারা। তারার নিজস্ব আলো আছে; কিন্তু সে দূরবর্তী, তাই তার আলো চোখ ঝলসায় না।

নীতার মতো মেয়েরা শুধু দিতেই জানে, দিয়েই আনন্দ পায়। নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে রেখে শুধু আশেপাশের চারিদিককে সৌরভে ভরিয়ে তোলাই তাদের কাজ। পরিবর্তে তাদের পাওনার খাতায় শুধু শূন্যই লেখা থাকে। নীতাকে দেখে মনে হয়—'যেন অভিশাপগ্রস্ত কোন নারী ও, জীবনের সঞ্জীবনী মন্ত্র সে জানে, শেখাতে পারে, তাই দিয়ে বাঁচবে

অন্যজন'[১৬]। অথচ তার জীবনে সে মন্ত্রসাধন ব্যর্থ হয়ে যায়। একটা মেয়েকে সেই যুগে টুঁটি টিপে বিয়ের নামে গঙ্গাযাত্রী বুড়োর সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। বছর খানেক পরই বিধবা হয়ে নিজের সব সাধ-কামনা চুকিয়ে দিয়ে সে মেয়ে সংসারের ঘানি টানতো, বইতো কঠিন ব্যর্থ জীবনের বোঝা। আর একালেও প্রগতির নাম করে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বয়ে নিজের জীবনের সব আশা-ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মধ্যেও সেই দিনের ব্যর্থতার সঙ্গে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। নীতা এই যুগের একটি বলি মাত্র—একা নীতা নয়—আছে আরও অনেক অনেক নীতা।

একমাত্র শঙ্কর চিনেছিল নীতাকে। তাই সে নীতাকে সতর্ক করতে একদিন বলে—'পরের দুঃখে যারা কষ্ট পায়, তাদের দুঃখ কোনদিনই ঘোচে না—ঘুচতে পারে না। পরে হাড়ে হাড়ে বুঝবি। তুই একটা আস্ত ইডিয়ট—দেখবি তোর ঘাড়ে পা দিয়ে অনেকেই উঠে যাবে উপরে, পড়ে থাকবি তুই। দোতলায় উঠলে নীচের সিঁড়িটার খবর কে রাখে বল? সবাই যেদিন একটি একটি ঘাড়ের খোঁজ পাবে সেদিন দেখবি তোকে ঠকাতে আর কেউ বাকি রাখবে না। এন্তার ঠকছিসও'[১৭]।

সনৎ যখন কাঞ্চন ছেড়ে কাঁচে অকৃষ্ট হয়েছে এবং তাতে মায়ের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তখনও নীতা ভাবে গীতার জন্যে না হয় আরও কিছু ত্যাগ করবে সে, চরম ত্যাগ এবং তাই করেও সে। মা কাদম্বিনী বড়ো মেয়ের আগে ছোটো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে তার সাফাই গাইতে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের বলে—'ও মেয়ের ধনুকভাঙা পণ, এম.এ পাশ না করে বিয়ে করবে না। কি করি এদিকে এমন ছেলে হাতছাড়া হয়ে যায়, গীতার সঙ্গেই ঠিক করলাম বাধ্য হয়ে'[১৮]। অর্থাৎ নীতার ঘাড়েই বন্দুক রেখে তার প্রতি অবিচার করতে মা-ও পিছপা হন না। অবাক হই আমরা, যখন দেখি বিয়ে বাড়ির সব কাজের ভার নীতাই তুলে নেয়। এমন কি বাসর ঘরে গান ধরে 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে ....'। এ যে তার নিজের হাতে নিজের হনন। তবু জীবনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় নীতার মনে হয় সংসার একেবারে নিষ্করুণ নয়। বেঁচে থাকার একটা আনন্দ আছে—'আকাশে কোথাও এতটুকু মেঘ নেই, ঝড়ের এতটুকু চিহ্ন নেই। চাঁদ উঠেছে। কোন নিভৃত সত্তা মাঝে মাঝে যেন জেগে ওঠে দুর্বার অদৃশ্য আগ্রহে—বিরাটকে ধরতে চায় সে। অসীমকে স্পর্শ করতে চায় দেহ-মন দিয়ে'[১৯]।

শঙ্কর চলে যায়; নীতা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো মুখ বুজে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে থাকে, মনে করে শঙ্করের সাবধানবাণী—'তুই এ সংসারের রূপ বদলাতে পারবি না। ওরে, ঘুণ ধরে গেছে এই কাঠামোর মজ্জায় মজ্জায়। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত সংসার টিকবে না, ওরা সবাই মরবে—সুতরাং তোর দুঃখ কোনকালেই ঘুচবে না'[২০]। নীতার দুঃখ ঘোচে না, ঘুচতে পারে না। নীতার রাজরোগ শঙ্করের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ায় বিব্রত নীতা হাসে। সে হাসি মলিন কান্নায় ভেজা। বাতাসে ঝরা বকুলের কান্নার মতো। হাসতে হাসতে নীতা বলে—'এবার বোধহয় সব কাজ থেকে ছুটি পাবো রে বড়দা। আমার কাজও ফুরিয়েছে—সে সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনও'[২১]।

অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে শঙ্কর। 'সব দিক থেকে নীতা আজ নিঃস্ব। তার যা কিছু ছিল সবই দিয়েছে সংসারকে। কটি হতভাগ্য মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে নিজের জীবনীশক্তিটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করেছে। আজ দিন ফিরেছে, এ বাড়ির মরা গাছে আবার এসেছে পত্রশোভা—ফুলের ইশারা'[২২]। কিন্তু নীতার যাবার ডাক পড়েছে অন্য এক জগতে। সবদিক থেকে নিঃস্ব হয়েও নীতা বিজয়ী হয়েছে। মুখে তার কোথাও বেদনার ছাপ নেই যেন মুক্তির স্বাদ পেয়েছে সে অসীম আকাশের দিগন্তে। শঙ্কর বলে ওঠে—'খুব খুশি হয়েছিস তুই? না?' জবাব দেয় নীতা—'কেন হব না! তোমার কণ্ঠ থেকে যে সুর বের হয় লোকের মনে হাসির কান্নার ঢেউ আনে—তাতে তুমি কি খুশি হও না? আমার চেষ্টা সফল হয়েছে। ওরা বাঁচবার আশা পেয়েছে—নাইবা আর রইলাম সেখানে আমি'[২৩]। সবাই তখন জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। সনৎ, মন্টু এমনকি বাবা মাধববাবুও। তার বই বাজারে ভালো চলছে, পাকা বাড়ি হচ্ছে, নীতার তাই সত্যিই সংসারে দেবার আর কিছু নেই। নীতার ডাক পড়েছে অন্য জগতে। পরেশের ট্যাক্সি করে শঙ্কর নীতাকে স্টেশনে নিয়ে যায় স্যানিটোরিয়ামের পথে ট্রেন ধরতে। পরেশ নীতার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ নীতার এই চরম পরিণতিতে সেও স্টেশনে পৌঁছে চোখের জল রুখতে পারে না, চোখের জল গোপন করতেই বুঝিবা অকারণে খদ্দের ফিরিয়ে দেয়।

সংসার থেমে থাকে না। নীতা যে স্যানিটোরিয়াম থেকে আর ফিরল না, তাতে সংসারের গতি থমকেও থাকেনি। নীতাদের দো-তালা পাকা বাড়ি হয়েছে, তবে বাইরে শঙ্করের যে ঘরে নীতা থাকতো, শঙ্করের ইচ্ছায় সেই ঘরখানি পাকা করা হয়নি, কথা ছিল নীতা ভালো হয়ে ফিরে এলে তার পছন্দ মতো ঘরখানি তৈরি হবে; নীতা ফিরে আসেনি—'এতদিন পর সেই কাঁচা ঘরের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। সেখানে জমেছে ঘন সবুজ গাছ-গাছালি, পাখি ডাকে পত্রাবরণ থেকে'[২৪]।

লেখক উপন্যাসটি শেষ করেছেন শঙ্করের প্রতিক্রিয়া দিয়ে—'একজনকে নিঃশেষে ভুলে গেছে এরা। ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। পায়ে পায়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসে শঙ্কর। কলোনির রাস্তায় দু-একজন লোক চলেছে। এমনকে মনে পড়ে—সে নীতা। কালো ডাগর চোখ, জীর্ণ মলিন রঙ, আধ ময়লা শাড়ি পরে একটি মেয়ে দুবেলা যাতায়াত করতো কলোনির পথ দিয়ে আপিস আর ট্যুইশনিতে। শঙ্কর আনমনে পথ চলছে, হঠাৎ দূরে কাকে দেখে চমকে ওঠে—হ্যাঁ ঠিকই। তেমনি কে যেন চলেছে। নীতার মতোই দেহ-মনে কি এক হতাশ বেদনা। মলিন বিবর্ণ চাহনি, রোদে ঘেমে-নেয়ে উঠেছে। এগিয়ে যায় শঙ্কর, না নীতা নয়। তবে ওদের শ্রেণীরই একজন পথে ঘাটে আপিসে স্কুলে ওদের দেখা মেলে। জীবনে ওরা স্নেহ-প্রেম-প্রীতি কিছুই পায়নি—সবাই ঠকিয়েছে ওদের। এতটুকু ভালবাসা থেকেও পৃথিবী ওদের বঞ্চিত করেছে। বুকভরা প্রেম ব্যর্থ জ্বালায় খাক করে দেয় ওদের। নীরবে এগিয়ে চলল শঙ্কর স্টেশনের দিকে। স্ট্র্যাপ ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটা টানতে টানতে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে। ট্রেনের ঘণ্টা হয়ে গেছে তার। এ ট্রেন ফেল করলে আপিসে লেট হয়ে যাবে। নীতার কথা মনে হয় শঙ্করের। সেও ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে গেছে শূন্য হাতে'[২৫]।

নীতা ফিরে যায়—ফিরে যায় নীতার মতো আরও অনেক নীতারা—শূন্য হাতে। কিন্তু তার বেঁচে থাকার মর্মভেদী আকুতি পাঠক হৃদয়ের গভীরে অনুরণিত হতে থাকে—পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়, ছড়িয়ে পড়ে সেই গভীর আকুতি, 'দাদা আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম .... আমি যে বাঁচতে বড় ভালবাসি। দাদা আমি বাঁচব'। এ আসলে সব নীতাদেরই আকুতি। কাহিনিতে নয় সিনেমাতে নয় নীতা বেঁচে থাকে সর্বকালের পাঠক ও দর্শকের হৃদয়ে। আর 'মেঘে ঢাকা তারা'র কাহিনিকার থেকে যান মেঘের আড়ালে। দেবব্রত বিশ্বাসের রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং পণ্ডিত রবিশংকরের সুরারোপে শঙ্করের কণ্ঠে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আজও আমাদের মধ্যে মেঘ, আকাশ, তারা, মাটি, মানুষের সম্পর্কে অনুরণন তোলে।

তথ্যসূত্র

১. শক্তিপদ রাজগুরু, মেঘে ঢাকা তারা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭, পৃ. ১৪।
২. তদেব, পৃ. ৫৮।
৩. তদেব, পৃ. ৫৬।
৪. তদেব, পৃ. ৫৭।
৫. তদেব, পৃ. ৬৫।
৬. তদেব, পৃ. ৬৫।
৭. তদেব, পৃ. ৬৫।
৮. তদেব, পৃ. ৬৫।
৯. তদেব, পৃ. ৬৯।
১০. তদেব, পৃ. ৫৪।
১১. তদেব, পৃ. ২১।
১২. তদেব, পৃ. ৩৩।
১৩. তদেব, পৃ. ৩৩।

১৪. তদেব, পৃ. ৩৪।
১৫. তদেব, পৃ. ২২।
১৬. তদেব, পৃ. ৯৯।
১৭. তদেব, পৃ. ৪৭।
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬।
১৯. তদেব, পৃ. ৬৫।
২০. তদেব, পৃ. ৯২।
২১. তদেব, পৃ. ১১৪।
২২. তদেব, পৃ. ১১৪।
২৩. তদেব, পৃ. ১১৪।
২৪. তদেব, পৃ. ১২৭।
২৫. তদেব, পৃ. ১২৮।

ঋণ স্বীকার

আকর গ্রন্থ

শক্তিপদ রাজগুরু, মেঘে ঢাকা তারা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০১, মাঘ ১৪০৭।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক)। 'এবং এই সময়' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ, ১০৭তম সংখ্যা।
প্রবন্ধ : 'চেনা মুখের নীতা : মেঘে ঢাকা তারা', নিশীথ রায়চৌধুরী ও 'দাদা, আমি কিন্তু বাঁচতে চেয়েছিলাম', শংকর বর্মণ, ১৪২১।
নিতাই পাল, কথা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে শক্তিপদ রাজগুরু :স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ২০১৩।

রত্না সাহা
অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার মহাবিদ্যালয়, নদিয়া

Humanity And The Technological Other In *Metropolis* And *L'Inhumaine*

Nabanita Karanjai

ABSTRACT

One of the main figures in science fiction, serving to question the assumed humanity of the protagonist and its race is the non-human, technological Other – the robot or the android. The narrative function of the android is in general to display their maker's power over nature, or of proving the maker's superiority to nature and other humans not engaged in the technological process therewith. It is only through the android's quest for asserting its own humanity and claiming equal status with its human makers that the protagonist is forced to reckon with his own humanity, or lack thereof. Therefore, the non-human Other is the principal signifier that forms the self-fashioning of the human subject and defining the ontological status of being human.

Keeping in mind the above trajectory of literary representation I wish to discuss Fritz Lang's *Metropolis* and Marcel L'Herbier's*L'Inhumaine* as presenting the "inhuman", technological Other that serves to question and define what it means to be human in the age of industrial technology. While interrogating the hubristic humanity of its human makers the robots in these two classics of Expressionist cinema also problematize gendered and sexualized representations of the technological Other. The mechanical body of the Other is seen as the object of intense desire : flesh turns to metal to fuel capital growth. The common denominator between the machine and the perverse, non-procreative sexuality of the 'femme fatale' in *Metropolis* and *L'Inhumaine* as being "inhuman", locates the issue of artistic practice at the core of industrialised modernity. Referring to Jean Francois Lyotard's *The Inhuman* (1989) I propose that the lack of humanity brought to light through representations of the machinic Other symbolizes the quintessential humanity of the subject and points the discursive shift towards posthumanity. In other words, how the inhuman dialectically functions to define what it means to be human is the focus of my paper.

Keywords : technology, Other, inhuman, human

Introduction

In science fiction, the representation of the Other has always been hinged upon its difference from the human world it has been set up against. The manifestations of this Other can be either machinic or extra-terrestrial. Most of the time this Other is the technological or the machinic Other that by its very difference establishes and re-establishes what it means to be human. Therefore, the presence of the non-human, while it aims at propagating the very humanist concepts that led to its existence, ends up re-enforcing humanist concepts while proceeding

Karanjai, Nabanita : Humanity And The Technological Other In *Metropolis* And *L'Inhumaine*

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 48-57, ISSN 2249-4332

to interrogate and subvert them. This leads to the question, what is the kind of 'humanity' that is espoused in culture? Is the so-called humanity something that homogenizes and imposes 'universalising essence' according to what it believes is right? What are the politics of representation behind the definition of 'humanity' as such? These are some of the concerns that will be the focus of this paper.

Androids—robots that look like humans—serve as central characters in popular science fiction all the way back to the origins of those forms. In cinema like *Metropolis* and *L'Inhumaine*, they primarily have two values: they are mostly symbols of technological threat—the dangers of industrialism and the dangers of human ingenuity and automated slave labor in later ones. These narratives already work towards debunking the myth of humanist progress brought about by science and technology. At the same time they propose a different idea of what does it mean to be human, one that can only be called 'posthuman'. Androids and robots made in the image of man are literal posthumans, a new hybrid species of future human modified by advanced technology. As they simulate humanity they bring about an active, conscious blurring between machines and humans. This has caused idea of the humanist subject to being undermined, and consequently has led to a re-evaluation of the subject in the face of technological change.

Interrogating Humanism

The humanist conception of man as an autonomous, self-regulating and rational being capable of individual perfection has been debunked since the 1960s as propagating a monolithic image of man as primarily white, male, straight and European. The Other has been exoticised and at the same time has been reduced to a homogenizing essence that conforms to an 'identical' human nature, that "their diversity is only formal and does not belie the existence of a common mould"(Barthes). This shows humanism's inability to imagine the Other on terms of the Other …all petit-bourgeois mythology is this impotence to imagine the Other. Otherness is the concept most antipathetic to 'commonsense'. Every myth tends fatally toa narrowanthropomorphism and, worse still, to what might becalled an anthropomorphism of class. (Barthes)

The issue of imagining the Other was sidelined and what took precedence was the establishment of the subject as mediated through ideology of the State (Althusser), the unconscious (Lacan) and through history (Foucault). In the unravelling of the category of the human, poststructuralist theory ended up talking about the human. This was pointed out by Jacques Derrida in his critique of Michel Foucault's *Madness and Civilization*, in which Foucault discusses the humanist tradition of reason, which habitually exiles madness by making it nothing but a silent object, an other, an outside. According to Derrida, Foucault's 'archaeology of science' is itself "an organized language, a project, an order, a sentence, a syntax, a work"(Derrida) repeats precisely what it claims to repeal: the book is perfectly reasonable, logical, ordered, coherent and therefore the subscribing to the rationale of Enlightenment that has proved the zenith of humanism. What is notable about Derrida's words are is "reluctance

to be seduced by anti-humanism's appeal to a pure outside." (Badmington) Because every aspect of western thought is touched in some way by the legacy of humanism, any claim to be marking the end of 'Man' is bound to be marked with the language of 'Man'. In this way, by exposing the humanist strands in anti-humanist thought, Derrida exposes the humanism contained within anti-humanism.

What is required therefore is critical thought that takes into account the exclusionary nature of humanism and simultaneously corrects it and proposes a new way of thinking through the addition of the prefix 'post'. The prefix 'post' tends to question the unity of its category and hence the unity, uniformity and integrity of the human. This type of reading opens up the possibility to think of "posthumanization" (Herbrechter)as a much more radical and liberating form of humanization. In its tendency to exclude the Other humanist thought comes across as more inhuman than non-humans such as nature, androids and animals. If the machinic and technological Other like androids and robots are seen as objective correlatives for the inhumanity inhabiting the core of humanist thought, then the 'posthumans' can be seen as harbouring the real 'crisis' of humanism. The surfacing of 'humanity' by affirming the lucrative status of the human on the part of the machinicOther, and the consequent expression of 'inhumanity' by the human protagonist in narratives of science fiction can be regarded as the posthumanist moment. Thus, it is the inhuman that becomes the ultimate signifier of humanity, and it is the acknowledgement of the inhuman within the human is what forms posthumanism.

<u>Thought and the 'Human'</u>

Jean Francois Lyotard's*The Inhuman*(1989) provides an excellent insight into how the pursuit of self-perfectibility through scientific and technological advances, taken to be the nadir of being human, is actually de-humanising instead. *The Inhuman* begins by describing the principal form that the "inhuman" has taken in postmodernity: the dehumanizing inhumanism of contemporary capitalism and its reduction of the human to modes of efficiency and the needs of the technocratic order, specifically through the ideology of "development". Under this rubric, what is dubbed the human is constrained to become more like machines in their functioning, or indeed that the machines we have built will replace us in terms of the thinking we thought integral to the human being. The opening essay, "Can Thought Go on without a Body?"(Lyotard 9)takes this up as the ultimate dream of technoscience, argues in a dialogue between a "he" and a "she", that "the sole serious question [to] face humanity today". Techno-science, the "he" claims, can escape the fate of annihilation through solar catastrophe, by the application of technologies that make consciousness disembodied. This would ultimately reduce "All the events and disasters we're familiar with and try to think of…as no more than pale simulacra" (Lyotard 11). Lyotard's surmise is that technoscience is driven by a need to conquer our being-towards-death and indeed, the possibility of the ultimate finitude of any living-on of any memory or history of humanity marked by the coming solar catastrophe. Digital technologies offer the hope of a becoming-inhuman of thought, of thought going on without a body, one

that "she" offers would have to transcend "the differend of gender" and corporeal existence (Lyotard 22-23). This position is also taken by N. Katherine Hayles' book *How We Became Posthuman*(1999) where to become disembodied is to, in effect, lose our humanity altogether. Referring to Hans Moravec's*Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence*Hayles writes

> …he invents a fantasy scenario in which a robot surgeon purees the human brain in a kind of cranial liposuction, reading the information in eachmolecular layer as it is stripped away and transferringthe information into a computer. Even assuming such a separation was possible, how could anyone think that consciousness in an entirely different medium would remain unchanged, as if it had no connection withembodiment?(Hayles)

Moravec, Hayles concludes, "is not abandoning the autonomous liberal subject but is expanding its prerogatives into the realm of the posthuman"(Hayles)for the seeminglyposthumanist desire to download consciousness into a gleaming digital environment is itself inspired from the distinctly humanist matrix of Cartesian dualism.(Badmington) Such transhumanist attitudes are nothing but re-affirming the negating aspects of humanism that have to be counteracted. Going back to Lyotard's attribution of the feminine to the desire for digital (dis)embodiment, the gendering of technology adds to the problematizing of the question of the inhuman. It is in this light that this paper focusses on Fritz Lang's *Metropolis* and Marcel L'Herbier's*L'Inhumaine*, where the non-procreative female body and expression of sexuality is seen as eroticized representations of the technological Other and of technology itself(Braidotti) This kind of representation throws into relief the glaring discrepancies between what humanist thought professes and what it actually practices. It strengthens the case against humanism and urges the need for re-consideration of what entails the definition of the 'human'.

The 'inhumanity' of the female Technological Other- Marcel L'Herbier's*L'Inhumaine*

Both classics of Expressionist cinema, Fritz Lang's *Metropolis* and Marcel L'Herbier's*L'Inhumaine* illustrate the problematic of gendering of technology. In both the films the feminine is positioned as 'inhuman' in juxtaposition with the male scientist who poses as the flag-bearer of theexcellence of humanity and modernity. Released in 1924, Marcel L'Herbier's*L'Inhumaine*equates patriarchal mastery of technology with domination over the female body and sexuality. In the opening credits, where the film's title is seen against an animated background of moving machine parts, the refusal of heterosexual love is equated to a denial of the flesh: the woman is seen as cold, unfeeling machine. The film shows the celebrated diva Claire Lescot, played by the opera singer Georgette Leblanc welcoming a range of male suitors – a Russian revolutionary, an American impresario, an Indian Maharajah. Each of them attempts to woo her, but she rebuffs them. Her final suitor, the young engineer EinarNorsen, arrives and similarly sets about wooing Claire; she callously rejects him. From the beginning

of the film, then, there is an emphasis on Claire's 'inhumanity', that is to say her resistance to male desire, and especially her insensibility to the lovelorn Einar. When Einar apparently commits suicide and Claire is forced to acquiesce to his desire out of guilt, it is revealed that he is alive and his 'suicide' was only a ploy to bring out Claire's 'humanity'. Towards the end when Claire is poisoned by the jealous Maharajah, she is resuscitated by Einar's machine which somehow makes her 'human' again, recuperates her for 'humanity' (and, crucially, makes her receptive to his love). The end of the film, then, sees the emergence of a figure of woman who is no longer 'inhuman' but arguably posthuman. Claire is not brought back to life as a cyborg – that is, her body is not supplemented by any electro-mechanical ormachine-produced prosthesis – but she is nevertheless posthuman in the sense that her whole recreated being is technologically mediated, and thus challenges distinctions between life and non-life, organic and inorganic, natural and artificial. She is not just reanimated but also reconfigured, in this final scene, by Einar's mysterious machine.

There are two machines in this film. One is the radio, that realizes Claire's "'dream of panoptic vision'(Miller) by using radio technology to broadcast her voice, singing to all corners of empire, while at the same time enjoying the spectacle of spectators- Europeans in their homes, places of work and in transit, but also turbaned Arabs and an African woman – listening to her. These spectators are united in their appreciation of Claire's voice, as 'the very voice of French culture'. In this respect, the film certainly reflects the universalist assumptions of the French colonialist project as it continued to be pursued in the 1920s. Einar (whose surname, Norsen, highlights his Nordic, Aryan origins has audio-visual inventions which allow Claire to stay in France and yet be everywhere at once. Claire is ostensibly empowered by technology, since the radio and televisual equipment allows her to fulfil her desires (her desire, in particular, to reach a global audience). As the voice of French cultural imperialism, she is placed in a position of power; she sees her listeners as she sings to them, but the technology constrains them to passive reception: they do not have the opportunity to speak back. And yet it is important to note that Claire uses this technology under Einar's careful guidance, and that this is part of his plan to prevent Claire from leaving France, so that his own desire for her can ultimately be fulfilled. Moreover, as a user of technology rather than an inventor or creator Claire occupies an ambivalent, intermediate position which echoes her status as a singer – not-quite-artist, but rather as a mediator, in whom the work of art does not originate but who rather provides her body as medium of expression for the composer's creative energies. In this sense Claire herself comes to embody the qualities of the radio technology she uses, both standing as mediums or conduits for male desires and creative impulses. Thus the feminine becomes an instrument in the hands of patriarchal agency, being relegated to the status of the inhuman and denied the agency of self-definition that principally constitutes humanist prerogative.

Another way in which the feminine is rendered inhuman is its conjunction with the black body that symbolizes the imperialist dimension of 1920s France. The display of the eroticized black body contains echoes of the human zoos which continued to entertain Parisian crowds

well into the 1930s. Given the camera's close attention to the fireeater's exoticized and eroticized body, one might assume that he is an object of Claire's fascination, and that, metaphorically, she is also 'playing with fire' in terms of her own sexual desires and behaviour. In fact, the fire-eater's performance occurs in counterpoint to the episode in which Einar is rejected by Claire, with the latter taking place in the garden, a setting not only spatially removed from the banquet hall and the jazz performance (its separateness emphasized by the use of different coloured tints for the two spaces), but one which seems to represent a cultivated, ostentatious artificiality, suggesting that Claire herself is estranged from nature, from the body, and from 'natural' desires. Claire's wild desires need to be tamed but rather that desire must be awakened in her: she remains a cruel, inaccessible Symbolist 'femme de glace', set apart from the 'techno-primitive' influence of jazz.(Shanahan) She needs not just a moral re-education but a complete transformation, and eventually will be 'remade' by Einar's technology into a desiring, and in turn receptive, heterosexual partner.

As she reciprocates Einar's advances towards the end of the film, Claire is restored into the status of 'humanity', which effectively stands-in for male, patriarchal prerogatives in sexual politics. The machine that reanimates Claire is an amalgam of wires and glass tubes,labelled '*danger de mort*' (danger of death). L'Herbier does not describe the machine in detail, presenting it in simplified mechanical elements instead. This is the aesthetics of the machine abstracted from function; but in reducing the machine to its schematic appearances there is also an attempt to mythologize it by leaving room for it to perform 'magic': this is, after all, supposed to be a fairytale or marvellous story, as we are told in the opening credits. Paradoxically, then, it is the 'inhuman' machine that recuperates Claire and makes her 'human': technology is seen here as warm and humanizing, rather than cold and unfeeling.*L'Inhumaine* does not present a vision of technology that liberates woman, or even generates female pleasure for pleasure's sake; rather, the machine is a tool to shape and subjugate female desires to respond more readily to male needs.(Shingler) By ascribing humanity to coercive male desire and the ability to bring back to life to a piece of machinery, the feminine is presented as "inhuman". Thus the very category of the human, figured as the concept of 'Man' is problematized through the intersection of gender with technology.

<u>Industrialisation and the female body of the machine</u>

The concept of 'Man' is further discussed with the question of class and labour in Fritz Lang's *Metropolis*(1927). The first major film to treat androids seriously, Robot Maria, in *Metropolis*, exposes the pretensions to humanity by Freder and his capitalist father Johann 'Joh' Fredersen. Originally conceived as a prototype for a future robot force that will replace the human laborers who keep the city running, it is transformed into a double for human Maria on the orders of the cruel dictator-businessman who owns and runs Metropolis. His idea is to have it sow discord and chaos among the workers, who are on the verge of rebellion because of their oppressive lives. The irony is that Maria is a conciliating force, and Robot Maria's

actions will discredit her, worsening the workers restiveness; furthermore, Fredersen has heard her preach patience to the workers, calming them. Yet after he hears this, he orders his chief engineer, Rotwang, to transform his new robot into Robot Maria and to send it out to wreak havoc. His plot makes little sense, as it seems destructive to his own power, to the technology based order that underpins it, and so ultimately to himself.(LaGrandeur)The machine, especially in its cybernetic representations in modern art, thus has come to function as the cultural Other of technological society. Only by using the symbolic complexity of the cyborg figure as a foil onto which we project both the desire to improve our biological condition, that is to become more machine-like, and, at the same time, the anxiety about machines replacing the human body altogether, are we able to negotiate the increasing technologizing of the modern world.

Lang's city is the archetypal modern cityscape, a wasteland full of images of culture, representing the living world of human beings, and technology.(Benesch) By opening on a sequence of close-ups of the throbbing machinery the film virtually hones in on the subject of technological infringement in human living. Machines are everywhere in Metropolis and their omnipresence is notrestricted to the enlarged machine room that reaches down into the bowels. The central control and communication center, where the Master sides over his work force, literally bustles with technology. The rhetoric hinges on the imagery of a society divided by the capital/labor few- in both the metaphorical and topographical senses of the sure and abundance, while the workers are shown to pine away machine room, a barely camouflaged modern limbo dominated rhythm and noise of machinery. It sets up the perfect premise for the annihilating, life-denying force of technology embodied in the Android Maria.

The Android Maria is first presented as a mechanical Eve, a Salome-like figure seducing the participating capitalists as an eroticized representation of technology. Since the robot has been exclusively designed to satisfy the male drive for control and power (in the twofold sense that it is man-made and that its main purpose is to subjugate the workers), it is a compelling symbol of man's ability to construct technological artifacts which are to serve him and to fulfill his desires. Being clad in the bodily features of a woman, however, the robot also signifies that which is different from man (and therefore threatening), that is the feminine or, in psychoanalytical terms, the otherness of woman. Maria's reincarnation as a female android also implies a change of character: from virgin to vamp, from a nurturing mediator of social conflict to an aggressive agitator of revolutionary struggle. Hence the threat of the frenzied, sexually potent woman (in a crucial scene, the robot performs a seductive striptease in front of a lustfully gazing male audience) comes to represent the threat of the machine unleashed, the powers of creation turned loose against their creator. Fritz Lang's *Metropolis* thus looks at the early stages of industrialization where technology itself was fetishized and eroticized and women were construed as the instruments of technological production as such. The body of the android Maria therefore becomes the site of the contestation of capitalist and feminist discourses, seen as the Real of the cultural sphere of industrialist Weimar Germany in its

gendered representation of technology. By presenting her as a cyborg, Lang shows the anxieties towards technology projected onto the body of the woman. Cybernetic imagery also provided spaces for the staging of both the pervasiveness of modern technological paradigms and the nudging anxieties concurrent with the increasing dominance of the machine.(Rutsky) Allowing to represent such complexity, the cybernetic body finally developed into a powerful metaphor of technological culture. The patriarchal control of the Android-Maria backfires when at the moment of inciting a riot between the capitalists and the owners, the machine becomes a potent disruptive force that highlights the oppressed status of the workers. Taking on the resemblance of the worker-Maria the male vision of female sexuality as destructive and nihilistic is complete when the android becomes a rabble-rouser through inflammatory speeches and gestures,"a subversive force unleashing repressed social energies"(Ruppert).

In opposition to the Android-Maria there is the worker-Maria who exhorts Christian values of patience and forbearance into the minds of the oppressed labourers. While narrating the tale of the Tower of Babel she emphasizes the alienation and fragmentation of the ruling class and workers, thus making the workers more aware of their oppression. Therefore it is appropriate that the android is built in her likeness, for it becomes the machinic embodiment of her dissent. Lang infuses Madonna-like characteristics into the worker-Maria and she comes to personify, even more than Freder, the emotive and spiritual dimensions that are excluded from Fredersen's world of rationality and efficiency. However her narration of the tale of the Tower of Babel problematizes her nurturing persona and effectively works to subvert the patriarchal expectations of femininity. In this respect, Maria and her machinic double are metaphorically working together to overthrow the extant socio-economic system of Metropolis. Flesh and metal work in unison and this marks a true posthumanist collaboration between woman and machine. The woman is systematically excluded from the realms of logicality and efficiency that have created the machine; the machine has been created to materialize the unbridled greed for greater consumption and profit for the capitalists. Both are treated as instrumental meansto serve capitalist, patriarchal ends. The android Maria made in the image of Hel, Rotwang's unrequited love and Freder's mother, acts out the destructive potential of thwarted love and lust for panoptic control.It is worth noting that besides Maria and her double, women are seen on the screen only at the time of the riot- all the other montages are peopled solely by male characters, both capitalists and workers. The ending of the film reinforces the binary roles of nurturer (the worker Maria) and seducer (the Android Maria) by destroying the android and relegating Maria to the position of the ideal helpmate for Freder who shakes hands with the workers and looks forward to a new social order aimed at bridging the gap between the capitalists and the workers. Peter Ruppert notes,

In the final shot we see the boundaries firmly back in place. The workers–all males again–are reduced to robots as they march uniformly toward their old Master and Freder, their new Mediator. Visually they are as separated by boundaries as they were in the beginning of the film. Maria stands off to the side, subservient, reduced to a reproductive organ, perhaps for

the next Master of Metropolis. Rotwang is dead, the cyborg has been burned and made into the scapegoat, capitalism remains firmly in control of technological power, and the workers' wives are again invisible. Still, the relationship between the machine and the human remains inconclusive: the female cyborg has shown us the potentially liberating power of technology to tear down the boundaries that fragment and exclude, boundaries that must now be seen as contingent, permeable, and capable of being transgressed. (Ruppert)

Conclusion

The feminization of technology in Metropolis and L'Inhumaine therefore shed light on realities that are heavily influenced by technology. While Claire Lescot is rendered an automaton subservient to the patriarchal will to control in artistry and imperialist expansion, the figure of Maria in Metropolis presents a more ambivalent picture of human coupling with technology. The two films offer a critique on the social and cultural uses of technology, and how using technology to bring egotistical motives to fruition (figured in the control of the female body) results in the destruction of all that can be considered human. The inhuman machine therefore becomes the remedy that can provide the solution to the problem caused by its existence. While it mimetically replicates the inhumanity of its creator, it also enables a dialectical understanding of what humanity truly means, and how that can be realized through rejection of the self-serving values of humanism.

Works Cited

Badmington, Neil. *Alien Chic : Posthumanism and The Other Within*. London and New York: Routledge, 2004.

Barthes, Roland. "The Great Family Of Man." *Mythologies*. Trans. Annette Lavers. London: Vintage, 1993. 100.

Benesch, Klaus. "Technology, Art, and the Cybernetic Body: The Cyborg as Cultural Other in Fritz Lang's"Metropolis" and Philip K. Dick's "Do Androids Dream of Electric Sheep?"." *American Studies* 44.3 (1999): 379-392.

Braidotti, Rosi. *The Posthuman*. Cambridge: Polity Press, 2013.

Derrida, Jacques. "Cogito and the History of Madness." *Writing And Difference*. Trans. Alan Bass. London: Routledge and Kegan paul, 1978. 31.

Hayles, N Katherine. *How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics*. Chicago and London: University Of Chicago Press, 1999.

Herbrechter, Stefan. *Posthumanism : A Critical Analysis*. New Delhi: Bloomsbury, 2013.

LaGrandeur, Kevin. "Androids and the Posthuman in Television and Film." *The Palgrave Handbook of Posthumanism in Film and Television*. Ed. Michael Hauskeller, Thomas D. Philbeck and Curtis D. Carbonell. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 111-120.

Lyotard, Jean Francois. *The Inhuman: Reflections on Time*. Cambridge : Polity Press, 1989.

Miller, Frank. *'L'Inhumaine, La Fin du monde'*. n.d.

Ruppert, Peter. "Technology and the Construction of Gender in Fritz Lang's Metropolis." 1 November 2000. *University of Colorado*.<https://www.colorado.edu/gendersarchive1998-2013/2000/11/01/technology-and-construction-gender-fritz-langs-metropolis>.

Rutsky, R L. "The Mediation of Technology and Gender : Metropolis, Nazism, Modernism." *New German Critique* 60 (1993): 3-32. <http://www.jstor.org/stable/488664>.

Shanahan, Maureen G. "Indeterminate and Inhuman : Georgette Leblanc in L'Inhumaine." *Cinema Journal* 43.4 (2004): 53-74.

Shingler, Katherine. "Technology and femininity in Marcel L'Herbier's L'Inhumaine." (n.d.).

Nabanita Karanjai,
Research Scholar, Deptt. of English
Bankura University

Unruly Mothers: Surrealism and Motherhood in Kothanodi

Nabanita Roy

Abstract

The narrative of Kothanodi, a film by Bhaskar Hazarika which has grabbed the National Film Award as the Best feature film in Assamese, 2015, plays with the idea of mothering. The film is based on the popular oral literature, compiled by Sahityarathi Laxminath Berbarua in his 1911 folktale collection, 'Burhi-aairShadhu' or 'Grandma's Tale'. The narrative of the film, intertwining four stories about the mother-child relation poses a threat to the normative understanding of the mother as an ideal subject of life/nourishment. If 'Teejimola' and 'Champawati' are haunted by schizophrenic mothers, 'The Story of Tawoi' and 'Ou Kuwori' are incarcerated with alienated mothers. In adapting the popular folk tales into the screen, Bhaskar Hazarika has critically questioned the culturally prevalent notions of the mother and split open the constitutive biases in constructing her identity. Replete with the folk cultural practices, the film negotiates the peripheral events, taboos, experiences, djinn, mixing the mundane with the surreal, yet the category of surreal remains a metaphor for her experience as a mother. The surreal then becomes a space inseparable from the narrative of the film, as well as a critical presence intimately associated with becoming a mother. The proposed paper will first look into the idea of mother and mothering as represented in the film with creative shifts from the folk tales that help re-vision her identity. And secondly, it will venture into the category of the 'surreal' not as an other-worldly event, but as a psycho-spatial reality.

Keywords- Kothanodi, Mothering, Surrealism, Supernatural, Grandma's Tale

> "The mind which plunges into Surrealism relives with glowing excitement the best part of its childhood." (Breton 39)

Introduction

That which is censored is repressed either to be divulged as absent or negotiated as irrational/non-sensical. The surrealist imagination revolves around this missing space to counter-mobilize the repressed through the "removal of the censorship" (Gauss 43). The removal of normative and restrictive social norms entails, in the words of Sharla Hutchinson, the artistic presentations of "failed sublimations or de-sublimations" that these representations "provided a window of opportunity for artists to shock audiences into being more critical of the social systems that influence human behavior" (Hutchinson 213). She also suggests that the shock can be processed through "a range of unspeakable human expressions: hysteria, obscenity, pornography, and violence" (Hutchinson 212).

Roy, Nabanita : Unruly Mothers: Surrealism and Motherhood in Kothanodi

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 58-64, ISSN 2249-4332

Surrealism as an "activity" (Clifford 539) and as an "experience" (Benjamin 48) pertains to the territory of "id" the "realm of erotic and the marvelous" which remains as repressive dreams and forbidden knowledge (Gauss 40). Surrealism also entails a blurring of the distinction between rational or irrational, as well as a converging paradigm of association, where "common sense interpolates with that of the "illusion" (41). Andre Breton's encounter with the writings of Sigmund Freud, as well as his service in Saint-Dizier Psychiatric Centre where he came across the patients with their "hallucinatory and delusional phenomena" (Kaplan 319) paved his way towards the new form of articulation-surrealism. James Clifford writes,

> In his classic History of Surrealism, Maurice Nadeau has stressed the formative impact of wartime experiences on the founders of the Surrealist Movement-Breton, Eluard, Aragon, Peret, Soupault. After Europe's collapse into barbarism and the manifest bankruptcy of the ideology of progress, after a deep fissure had opened between the experience of the trenches and the official language of heroism and victory, after the romantic rhetorical conventions of the nineteenth century had proved themselves incapable of representing the reality of the war, the world was permanently surrealist.

Surrealism as a twentieth-century artistic phenomenon diverted itself from the stale realities of social conformity pressing on the superior reality of certain forms that of dreams, hallucinations, that which escaped representation (Breton 23). Similarly, the camera had served in modern times to delineate the superiority of external naturalism, verifiable as scientific truth. Jonathan Crary states that modern time saw an unprecedented power of the camera "as a model, in both rationalist and empiricist thought, of how observation leads to truthful inferences about the world" (3) which eventually led to the "ubiquity of vision as the master sense of the modern era" (Jay 3). Surrealism, as such, through its techniques of representation, can help replace the apparent as uncanny and the imaginative as real. The film Kothanodi similarly plays with the act of seeing as a metaphor for the surreal.

Kothanodi

Folk tales and myth that relish in the disruption of normalcy and transgressive imaginations, allowing a kindred cohabitation of multispecies and proffering agency to both humans and non-humans, has always privileged the irrational. Albeit, irrationality is only a method of seeing or visibly comprehending the unknown, the repressed, or the unconscious. It cuts the cluttering of self-referentiality of truth, to privilege other ways of seeing. The filmKothanodi or The River of Fables likewise captivates the uncanny domains of the Assamese folk tales. The psychic life of the villagers in the pre-colonial setting, their beliefs, moorings, and living, mixed with the magical and supernatural, allows Bhaskar Hazarika to negotiate the alternate realities of existence and its (surreal) possibilities.

Adapted from the folktales collected and compiled by SahityarathiLaxminathBerbarua in his 1911 folktale collection, Burhi-aairShadhu or Grandma's Tale, Bhaskar Hazarika's film

Kothanodi engages with four grim tales revolving around the theme of motherhood. The stories are popular bedtime stories that have circulated in Assam at different periods. The film incorporates four tales from the collection, "Teejimola", "Champawati", "The Story of Tawoi" and "Ou Princess". The stories have been interspersed together to form a single narrative, with the common theme of motherhood. Mothers and motherhood are central to all four stories. Added to this, the tales have been either reimagined with some creative shifts or partly truncated to fit in the thematic requirement of the film. It also departs from the original tale to allow the character of each of these four tales to freely interact with each other, such that the monotony of the stories as separate tales is broken. Almost in tune with the supernaturalism that the film and the stories entail, the characters, as well as the plot, overcome their singularity to form a collective, with the text as a spatial backdrop against which the performance takes place. Thus, each of these tales is heavily dependent on one another, creating a creative space of interaction. The technique thus enables the plot to smoothly cut across the borders of the tales.

The film starts with the story "The Tale of Tawoi", which deals with the ordeals of a couple, Poonai and Malati, who repeatedly bury their newborn child, under the supervision of tawoi or the uncle of Poonai. It begins with the act of digging- Poonai frantically burying his child. Tawoi, who has been entrusted by Poonai's dying father to consider his upbringing, is a soothsayer, capable of foreseeing the future. According to his clairvoyance, each of these children would have grown up to fatally injure or harm the father, hence the violent act of filicide. For tawoi these children were nothing but monsters. It is only with the fourth child, that tawoi orders a halt to this killing spree. The film departs from the original tale, privileging the mother as the chief source of resistance instead of the father, who resolves to kill tawoi, if only he ordered the same for their fourth child. The narrative of the tale keeps returning along with the other stories. The film, then introduces its second tale, that of "Ou Princess" or "The Outenga Maiden". The film makes a seminal shift in this tale as well, the princess is replaced by an ordinary village woman, Keteki, who gives birth to an outenga or the elephant apple, a sour fruit frequently used in Assamese cuisine. The woman weaves to survive after being cast out by her husband for giving birth to a fruit instead of a human child. The fruit is animated, such that it follows Keteki wherever she travels. Keteki believes it to be her child. It is later with the help of Devinath, father of Tejimola, who is a garments trader visiting Keteki for his orders, the repressed child inside the fruit is freed/released from within. The film proceeds with the story of "Teejimola" followed by the story of "Champawati". Both these tales are the darkest among the lot. It's macabre and grimness resounds mostly through the exploitative interaction between the daughter-mother duos, in the respective tales.

Although death is omnipresent in all four tales, the last two confounds the senses through its bizarre and seemingly outlandish storyline. Both these tales have been subtly interwoven. Teejimola is a young girl, murdered by her stepmother while her father, Devinath, a garments trader, travels to a faraway land for business. Hazarika introduces a djinn in the tale, to

contextualize the psychotic Senehi, the stepmother. She is represented as a gruesome matriarch who abominably unleashes violence and abuse on Teejmola before smashing her head with the dheki, a traditional rice husking arrangement made of wood. Only a section from the tale of "Champawati" is presented in the film, involving the marriage of Bonolotika to a wild python and her consequent death by being devoured by the python. Bonolotika is the daughter of Dhoneswari, the younger wife, whereas Champawati is the daughter of the younger wife, Rupeshwari. The book explicitly deals with the fate and ordeals of Champawati rather than Bonolitika, who is chosen by the python, a shape-shifting folk god, who bestows her with immense wealth on their wedding night. Dhoneshwari, the greedy mother hence orders her husband to make a similar arrangement of marrying their daughter to a python. Rather, this time, the python was no god, but a devouring creature who fully consumes Bonolotika. Representing Bonolotika's fate is specifically Hazarika's creative take to understand Dhoneshwari and her identity as a mother who sacrifices her biological daughter.

Mothering and Motherhood

The "dangerous territory" (Breton 40) that the film divulges, subverts the logic of mothering. It is removed from its naturalness or essentiality. Dhoneshwari partakes in sacrificing her biological daughter for vices such as greed and jealousy. Maloti unwillingly participates in burying her newborns, whereas Keteki is unable to perform mothering. On the other hand, Seneki, the stepmother, perpetrates violence on her daughter. The normative understanding of the mother as a caregiver is overturned against a magical backdrop where the living and dead, material and human, mythical and mundane is blurred. The effect of such blurring in turn compliments the break in the expected.

Andre Breton in his second manifesto of surrealism argues that the activity of surrealism lay in "finding and fixing" the "certain point of the mind at which life and death, the real and the imagined, past and future, the communicable and the incommunicable, high and low, cease to be perceived as contradictions" (123). Surrealism thereby liberates thought, language, and human experience from the narrow confinements of rationally validated realities, and simultaneously strives to make the uncanny familiar, digressing from the order of the Enlightenment. The psychic life of the mothers, presented as a difference throughout the film, provides a space for Hazarika to flip the normative reality as unreal, as well as the unreal as normative. As Gauss notes, for the surrealists "the domain of imagination (essential to art practice) is identified with the psychic life itself as distinguished from the reality of ordinary appearance which is the raw material for the action of our rationalization" (38). This very domain of psychic life can perhaps be translated as the reality which the film explores, subverts as well as upholds.

The case of Senehi and her involvement with an otherworldly man/spirit, a djinn, with whom she conspires to murder Teejimola, surfaces as the most imaginative leap in figuring the physic underpinnings involved in motherhood. The book features the death and resurrection

of Teejimola, involving a series of shape shifting, beginning with a gourd she then turns into a fruit, later a lotus, bird and finally into her original human form, aided by her father's magical powers. It is Teejimola's metamorphosis that primarily configures the storyline in the book. While the film provides only a glimpse of Teejimola's resurgence as a sprouting plant and devotes much attention to the djinn and Senehi's plotting. The film is bent towards the mother's perspective, dehumanizing/demonizing her through a surreal take. The djinn is an agency, a motif, that helps Hazarika to contextualize Senehi's status as a psychotic mother closing on hysteria. It speaks for Senehi's repressed desires. One may thus consider, as Sharla Hutchinson, suggests :

> a surrealist method for presenting the impact that restrictive social mores made on the human psyche through visual and literary depictions of shocking psychological regressions that result in transgressive behavior. As a subject matter for art, it demonstrates the surrealist commitment to compromise traditional aesthetics by shocking audiences with a range of unspeakable human expressions: hysteria, obscenity, pornography, and violence.

Contesting Desires

Desire in various forms mobilizes the destiny of the characters in the film- Poonai's desire to live, Keteki's desire to mother, Senehi's desire to inflict pain, Dhaneshwari's desire to contest Rupeshwari's life. Desire then stands at the crux of their psychosis, which the film deftly represents through the visceral moments of surrealism. Yet the film speculates the death of the spectator's desire through invoking the surreal, playing on the surreal to engage and dislodge the gaze simultaneously. The method helps to dislocate the object of desire to cancel the voyeuristic gaze of the spectator which creates naturalizing effects. Hutchinson, stating Laura Mulvey's theory of gaze suggests that "the undisturbed voyeur/ voyant relationship" can be disrupted in two ways, firstly "the production of the scene can be foregrounded to destroy the sense of realism, thereby exposing the object of desire as mere fabrication; or the object of desire can be distorted so that it no longer resembles itself" (215).

The object of desire, that is the mother-daughter relationship, in each of the tales is disembodied. The disembodiment happens through a series of onslaught on the expected. In the case of Senehi, the djinn animates the existence of Senehi as an evil stepmother, which is itself non-corporeal, albeit bestowed with a human form in the film. But the djinn is an abject presence, neither male nor female, nor completely human. For Poonai and Malati, the unnatural obedience to tawoi leads to the inhuman practice of burying the newborn. For Bonolotika and her mother Dhoneshwari, the wild python becomes a metaphor for the disruption that severs the normative expectations. The animated elephant apple, the fruit-bearing fruit within, magically confounds our senses. Within this practice of dislocation, surfaces yet another fact that gender is performative, ripping open the internal essence "of gender as manufactured through a sustained set of acts, posited through the gendered stylization of the body" (Butler

519). The cultural gaze of motherhood is suspended. Thus, the act of dislocating, shocking helps to question the notion of an ideal mother, as benevolent and reproductive. The non-reproductive bodies of Keteki and Senehi, posit them as alienated mothers. Such a nuanced understanding of the surrealist method employed in the film helps us to locate gender performativity as cultural and mothering and motherhood not as natural but rather cultural. Further, "by calling up the image of hysteria" and then "undermining the sense of reality" the film re-invents that the "body as no longer limited to the mask of femininity" (Hutchinson 220).

Conclusion

The denouement is an amplified canvas of life, death, and resurrections. Teejimola becomes a plant sprouting with vigor, the elephant apple becomes a magical child, the fourth child of Malati is miraculously salvaged, and Bonolotika becoming one with the forest python. These differences of living, becoming, dying, resurrecting deftly articulated in the movie, embraces the folk vision of unmitigated discrepancies and irrationalities. Surrealism in the film also becomes a method to engage in the psychic life of the mothers who desire to transcend conformities and normative identifications. It vouchsafes a critical entry to the interconnected tales of the mothers with their failures, moorings, crisis as well as transgressions. It is a means to engage with the other possibilities of reimagining motherhood and mothering, with their nuanced shades, that lie beyond rationalism and everyday common sense. It proliferates through transcending expectations. Malati ventures to kill tawoi, whereas Dhoneshwari sacrifices her daughter to her whim and fancy. In effect, the illusion of common sense itself disposes of the facticity of an ideal mother as a natural body into a culturally desiring object, a body saturated with performances. Constituting the psychological reality of the mothers which is often repressed or undermined, as a surrealist vision, and spatially realizing it through the film's text, saturates the core of Kothanodi. Thus, as Breton suggests, the "psychic automatism" as an expressive technique of surrealism practiced "in the absence of any control exercised by reason exempt from any aesthetic or moral concern"(26) is translated or can be understood in the film as the psychic enactment of the raw desires, that which is abhorred, loathed, fetishized as well as pornographized by the civilization.

Works Cited

Benjamin, W. (2020). Surrealism : The Last Snapshot of the European Intelligentsia, *Critical Theory and Society A Reader*, 172-183. doi :10.4324/9781003059509-17

Bezbaroa, Laxminath. *Grandma's Tale*, Translated by Pallavi Barua, Hornbill Publications, 2011.

Butler, Judith, "Performative Acts and Gender Constitution : An Essay in Phenomenology and Feminist Theory", *Theatre Journal*, Vol. 40, No. 4, 1988, pp. 519-531, JSTOR, www.jstor.org/stable/3207893.

Breton André, *Manifestoes of Surrealism*, Univ. of Michigan Press, 2012.

Clifford, James, "On Ethnographic Surrealism", *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 23, No. 4, 1981, pp. 539-564, JSTOR, www.jstor.org/stable/178393.
Crary, Jonathan, *Techniques of the Observer*, MIT Press, 1992.
Gauss, Charles E. "The Theoretical Backgrounds of Surrealism." *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 2, No. 8, 1943, pp. 37-44, *JSTOR*, www.jstor.org/stable/425943.
Hutchison, Sharla. "Convulsive Beauty : Images of Hysteria and Transgressive Sexuality Claude Cahun and Djuna Barnes." *Symploke*, Vol. 11, No. 1/2, 2003, pp. 212-226, *JSTOR*, www.jstor.org/stable/40536944.
Jay, Martin. "Scopic Regimes of Modernity." Vision and Visuality, edited by Foster, Hal, 1988, pp. 2-23.
Kaplan, Donald M. "Surrealism and Psychoanalysis : Notes on a Cultural Affair." *American Imago*, Vol. 46, No. 4, 1989, pp. 319-327, *JSTOR*, www.jstor.org/stable/26303838.
Kothanodi, Directed by Bhaskar Hazarika, Metanormal Motion Pictures, 2015.

Bio note :

Nabanita Roy is currently pursuing her PhD, in the department of English, University of North Bengal. Her research areas include gender, aesthetics and folklore. She is committed to research and has attended several seminars, contributed papers in journals, websites and webinars. She looks forward to undertake research-oriented projects and scholarly works. Apart from her research work, she is currently working on her documentary, as a competition winner under the project 'Articulating Women: Interrogating Intersectionality and Empowering Women Through Critical Engagements'.

Nabanita Roy
Research Scholar, Department of English
North Bengal University

Delineating Indian Diasporic Identities and Beyond :
Reading Select Films of Mira Nair and Deepa Mehta

Ananya Mukherjee

Abstract

Cinema has not only provided momentum to uphold the realities of the diasporic identities but also has a more extensive reach towards global visibility. Diasporic subjects usually have a strong nostalgia for the land they have left behind and for its culture, but they, simultaneously may consciously or unconsciously tend to acculturate and assimilate to the dominant culture of the new space. This research paper explores the influence of cinema in the identity construction of Indian diasporic audiences. This predominantly centres on the representation of Indian diasporic identities in select films of Mira Nair and Deepa Mehta. Mira Nair is considered one of a handful of diasporic film directors whose works have significantly transformed contemporary world cinema. Her aesthetic sensibility gestures toward the filmmaker's commitment to social justice, especially concerning women and socio-economically marginalised groups. On a similar note, the films of Deepa Mehta problematise the specific issues of gender, sexuality and oppression of women with an insight. Her works deal with controversial socio-political problems in Indian history. As both the filmmakers belong to the diasporic community themselves, their works often showcase displaced and dislocated subjects in their filmic narratives. This paper proposes to locate and identify how the issues of dislocation and displacement relatedly bring Indian diasporic experiences in the select films of Mira Nair and Deepa Mehta.

Key Words : Diaspora, displacement, assimilation.

The term 'diaspora' is a social formation outside the nation in origin. It was commonly associated with the Jewish diaspora in the classical period. Etymologically the term 'diaspora' is originated from the Greek composite verb diaspeírein, meaning to scatter through/across that corresponds to the process of dislocation and relocation. It is a movement or migration of people who are necessarily away from their homeland owing to partition, war, the pursuit of economic prosperity or surviving results of economic exploitation. Compared to the literature written by Indians in diaspora, filmmaking by diasporic Indians is considered a relatively recent activity that had emerged in the last quarter of the twentieth century. These films image the lives of diasporic people in the diasporic locations and also re-image their old homeland to further re-root their identity. Cinema has not only provided momentum to uphold the realities of the diasporic identities but also had a more extensive reach towards global visibility. Diasporic subjects usually have a strong nostalgia for the land they have left behind and for its culture but

Mukherjee, Ananya : Delineating Indian Diasporic Identities and beyond : Reading Select Films of Mira Nair and Deepa Mehta

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 17, No. 2, December 2020, Page : 65-71, ISSN 2249-4332

at the same time may consciously or unconsciously tend to acculturate and assimilate to the dominant culture of the new space (Lahiri 6). What is also noteworthy are the locations from where cinema is emanating, as well as the diasporic origins of the filmmakers themselves. This research explores the influence of the movies in the identity construction of Indian diasporic audiences.As observed by Jigna Desai, "Mira Nair and Deepa Mehta, whose films are constructed simultaneously for multiple audiences, pursue the possibility of maximum exposure within India for their films, attempting to simultaneously locate them within North American national cinemas as well as in relation Indian cinemas" (121). This research paper, therefore,centresaround the representation of Indian diasporic identities in select films of Mira Nair and Deepa Mehta.

Mira Nair is considered one of a handful of diasporic film directors whose work had significantly transformed contemporary world cinema. Her aesthetic sensibility gestures towards the filmmaker's commitment to social justice, especially concerning women and socio-economically marginalised groups. Her films that are considered self-evidently diasporic would include Salaam Bombay! (1988), Mississippi Masala (1991), Monsoon Wedding (2001), and The Namesake (2006). She uses documentary realism to show and explore diverse experiences of migration and displacement in her films. In Salaam Bombay!the narrative focuses on Krishna, a street kid where the diasporic sensibilities operate in a more complex and contradictory space to mirror the displacement primarily experienced by the Indian diasporic subjects. It is Krishna's desire to return to his parents or homeland that maybe seen as a different kind of diaspora where Krishna is a migrant stranger in the urban slums of Bombay, but he remains internally connected to his nostalgic homeland.The dislocated identity of Krishna continues to attribute to the filmic telos. The colony of prostitutes resonate the similar traits of insecurity and 'othering' that proliferate the germ of discrepancies within a society. The filmic narrative reiterates a sense of misplaced identity that dwells at the verge of the imagined homeland. Another text of Nair, Mississippi Masala explores the complex relationship between the black communities and the Indians, which directly portrays the diasporic dilemmas of the Indian family exiled from Uganda during the dictatorship of Idi Amin. Nair has a tendency to incorporate fluidity in shaping the transnational identity as in her filmMonsoon Wedding;shetries to focus on the nuptial in an Indian setting where a diasporic family comes to wed their son to an Indian girl and portrays a clash between tradition and modernity at the core of the middle-class Indian family. The struggle for searching one's existence becomes prominent in Nair's portrayal of tradition and modernity. The Namesake focuses on a sensitive and moving exploration of the crisis faced by Ashoke and Ashima, which shows a realist depiction of the diaspora as they migrate to America. The course of development in the character's identity construction further problematises the issues of marginalisation in western society. Considering the point of adaptation, the original text of Jhumpa Lahiri encounters with the diasporic consciousness of an 'imaginary' homeland and portrays the "in-betweenness" of Ashima's identity. The filmic text of Nair retrospectively encapsulates the crises of Ashima

being alienated in a foreign land. The semiotic reading of stepping into Ashoke's shoes problematises her existence and strategically subjugates her beinga woman. The course of evolution through incidents in the foreign land strengthens her character, and her final return to India after Ashoke's death reifies the lack of stability that she tries to restore through music. As Deepika Bahri observes:

> Ashima's return to her interrupted training in classical Indian music as she "follows her bliss" is part of the symphonic structure of a film that tries to represent the experience of a multicultural world through the use of contrapuntal notes, different melodies, and rhythmic structures.

In the 'original' text, Ashima's quest continues, but Nair's filmic text finds stability in Indian classical music as the rhythm reminds her of the nostalgic homeland that she is/was a part of. The mode of representation varies in the filmic adaptation as the screen projects the auteur's sensibility to assimilate the globalised identity. Filmic adaptation incorporates the narrative outline of the original text to mark it as fidel or infidel dwelling upon the cultural memory of the text.This cultural memory is articulated and interpreted by following a paradigm of "semiotic diaspora" in the film that reifies the image of the original text. The filmic narrative questions the concept of fidelity in adaptation through deliberately critiquing the idea of 'simulation'. The memory of the original text is retained and transferred into a new dimension of a visual trajectory. Commenting over the theory of fidelity in filmic adaptation, John Ellis comments :

> The adaptation consumes this memory, aiming to efface it with the presence of its own images. The successful adaptation is one that is able to replace the memory of the novel with the process of a filmic or televisual representation… The fruitfulness of the adaptation is the degree to which it can rework and replace a memory. (3-4)

Filmic narrative strategically allows adaptation without constraints for the purpose of achieving the desired impact, and for doing that, this sometimes reconstructs the original text. The question of fidelity in the filmic text introspectively looks into Linda Hutcheon'sobservation in her work, The Theory of Adaptation, as she comments :

> ... the term adaptation has a multi-layered application referring simultaneously to, the entity or product which is the result of transposing a particular source; the process through which the entity or product was created (including reinterpretation and re-creation of the source); and the process of reception, through which we experience adaptations as palimpsests through our memory of other works that resonate through repetition and variation, or in other words, the ways in which we associate the entity or product as both similar to and a departure from the original. (7)

Lahiri's original text explores the dilemma of departure with a sense of loss as the cultural de-linking excavates a discord in one's identity. This dual existence is a result of the forced assimilation of the cultural alienation. This loss of homeland and the forced assimilation shapes

this Bengali couple's identity accordingly. The filmic text addresses the anxieties and dilemmas of this 'in-betweenness' that shapes the Indian-American diasporic consciousness to accommodate the cultural 'aporia' in a foreign land. As Femke Stock, opines :

> Paradoxically, the deep contextuality of diasporic perceptions of a remembered 'original' home, together with its remoteness in time and space as well as the competition from other possible home spaces, makes 'home' a concept that is far from self-evident, while at the same time carrying strong connotations of exactly such a self-evidence. (25)

Diasporic subjects anticipate with cultural assimilation that is linked with the image of the 'original' home and this eventually reaffirms a nostalgic gaze upon the homeland by recreating a space to focus on the issues needed to be touched upon. The cinematic gaze upon the homeland is authenticated in the films of Deepa Mehta as she problematises the specific issues of gender, sexuality and women's oppression with an insight. Her trilogy Fire (1996), Earth (1998), and Water (2005) deal with controversial socio-political issues in Indian history. In Fire, the focus is on 1980s postcolonial India, and it portrays the concept of same-sex love to depict a sexual relationship between the protagonists Radha and Sita. It is an exploration of the choices women have and their process of becoming who they want without being punished for it; therefore, it criticises the question of sexual repression within a family and a society. As,Jaspal Kaur Singh, observes :

> The film does bring a taboo topic to the fore, and the director must certainly be lauded for her intensive effort so that the much needed social and cultural transformation can occur. However, it does so at the cost of demonising Indian patriarchy and fetishising oppression in monolithic terms. Additionally, in a culture where same-sex expressions of affection arc not seen as deviant, the portrayal of Sita and Radha, as two typical middle-class wives, who enjoy community and show affection in sexualised terms might have long-term detrimental effects on same-sex support. (152)

Mehta has tried to proliferate the displaced identity of a woman in Indian society after marriage. Sita and Radha both are characters from Indian mythology, and both are considered the epitome of self-sacrifice within a familial bond. The deliberate critiquing happens when these characters are simulated in a realistic space outside of myth, and the quest for one's self-orientation continued with a miraculous escape from the 'oppressed' familial bond. Mehta has inscribed a different narrative of love outside the heterosexual marital institution where these two women are trying to soothe each other by exploring their queer sexuality in a society where same-sex love was alienated and 'tabooed'.

Deepa Mehta's Earth (1998), is an adaptation of Pakistani writer BapsiSidhwa'sCracking India(1988).There is a deliberate shift of the ideological gaze from sexuality to the politics of nationalism. It tries to re-image India through the eyes of two women-BapsiSidhwa and Deepa Mehta. It represents the subaltern characters Ayah, a powerless Hindu woman in a yet to

form Muslim country and polio-stricken Lenny from the marginal Parsi community. Sidhwa's Cracking India explores the politics of nation-state and how power functions in controlling the female body. The engaging narrative of nationalism insinuates the politics of control over women and the theory of 'protecting' one's motherland also comes under the discourse of surveillance to the female body. In this context, Saman Ashfaq remarks :

> In any nationalist discourse, women play a central role in the imagination and construction of the nation-state where the nation is often venerated as a female, especially as a mother, drawing upon images of purity, honour, and nurture. The reality, however, is that this association renders their bodies vulnerable to the "outsider" or the "other". (31)

Rani Neutill critiques Mehta's film Earth by pointing out its differences from Sidhwa's original text as it lacks the depth in portraying the violence against women during the partition. The female body with a disability creates a dialogic relation with the violence and power performed by patriarchy (75). Neutill again observes : "Postcolonial feminism has been crucial in understanding the ways in which nationalism used and abused women, it has not taken into consideration the ways in which the Partition of India became a form of state-sanctioned and mandated heterosexuality" (75). Partition, war and body are intertwined with a thread of violence that provides agency to the nationas Clare Barker observes :

> Cracking India's Partition narrative is haunted by recurring images of corporeal dismemberment-tearing, cracking, bleeding, pain-that emerge from the protagonist Lenny's childhood experiences of disability…from recounting Lenny's personal narrative of disabled embodiment and corrective surgery to the cultural history of Partition and the social consequences of subcontinental politics.(95)

Mehta's treatment to violence anticipates with her intrinsic feminist approach that extends a cosmopolitan gaze to her female characters. The Indo-Canadian diasporic sensibility provides her with the agency to look into the domestic issues of torture and violence. Her filmic text celebrates this process of de-linking to escalate a sense of sublime. On a similar note, Water is set in the context of sacred Varanasi, but the image of India is metaphorically portrayed across the bodies of de-sexed widows who are sexually exploited by 'Seths' or powerful men. Thus, Mehta has tried concentrating on the displacement and dislocation of these widows and the process of their isolation from the mainstream society. As David F. Burton articulates : "Mehta depicts the hypocrisy of the Hindu priestly class; Brahmins are supposedly concerned with preserving their purity, and yet they use their highsocial status to justify the exploitation of vulnerable women and children" (4). Mehta has critiqued widowhood as a space for female subjugation, and the ashram is objectified protruding a panoptic gaze to its prisoners. Chhuiya and Kalyani become victims of brutal sexual abuse that questions the authority of the matriarch in the ashramathat further problematises religion as a repressive state apparatus in controlling the docile body. Mehta incorporates the question of familial 'honour' and Kalyani's suicide reinforces the social discrepancies ensuring a persistent impact in the mind of the audience.

Mehta has tried to focus on both physical and psychological trauma of displacement and alienation from an 'original' homeland, and this recurs in her works in establishing her position as an auteur. Her film, Midnight's Childrenis an adaptation of Salman Rushdie's novel of the same name. The narrative here reiterates a continuous state of displacement and identity confusion. It deals withflux in relationships and shows how the concept of identity is interconnected with a strand of belongingness and nostalgia. Here the auteur is engaged in re-rooting all the characters accordingly with the change of time and space. Film adaptation trades upon the memory of the original text by tracing its diasporic consciousness of Rushdie's Imaginary Homelands. The cinematic medium has, in this short time, reached out to a vast audience and has achieved global visibility and gathered awards as well. In today's global world of movement, our personal identities are changing. So, 'where is my home?' and 'what is my identity?' have become essential questions in one's life. In recent times more and more diasporic communities visit their homelands, perhaps to re-root their identities which explore the influence of the movies in the identity construction of Indian diasporic audiences. As both the filmmakers belong to the diasporic community themselves, their works often showcase displaced and dislocated subjects in their filmic narratives. Therefore, the filmic narrative proposes to locate and identify how the issues of dislocation and displacement essentially bring Indian diasporic experiences.

Works Cited

1947 : Earth, Dir. Deepa Mehta. Perf. Aamir Khan, Rahul Khanna, Nandita Das, Maia Sethna, Eros Entertainment. 1999. Film.

Ashfaq, Saman, "Communalism and the Discourse of Minority Women in Select Indian English Fictions", in International Journal on Studies in English Language and Literature, Vol. 2, Issue 3, March 2014, pp. 31-39.

Bahri, Deepika, "The Namesake: Deepika Bahri is Touched by Mira Nair's Vivid, Sonorous Account of Immigrant Life in an Adopted Home City" in Film Quarterly, Vol. 61, No. 1 (Fall 2007), pp. 10-15

Barker, C. Postcolonial Fiction and Disability : Exceptional Children, Metaphor and Materiality. Palgrave Macmillan, 2014.

Burton, F. David, "Fire, Water and The Goddess : The Films of Deepa Mehta and Satyajit Ray as Critiques of Hindu Patriarchy" in Journal of Religion & Film, Vol. 17, Issue 2, October 2013.

Desai, Jigna, "Bollywood Abroad: South Asian Diasporic Cosmopolitanism and Indian Cinema" in New Cosmopolitanisms : South Asians in the US. Ed. Gita Rajan, Shailja Sharma, Stanford University Press, 2006.

Ellis, John, "The Literary Adaptation : An Introduction," Screen, Vol. 23, Issue, 1, 1982. pp. 3-4

Fire, Dir. Deepa Mehta, Perf. Nandita Das, Shabana Azmi, Kaleidoscope Entertainment,

1998.Film.
Hutcheon, Linda, A Theory of Adaptation. Routledge, 2006.
Lahiri, Himadri. Diaspora Theory and Transnationalism.Orient Blackswan, 2019.
Midnight's Children, Dir. DeepaMehta. Perf. Shriya Saran, Satya Bhabha, Shabana Azmi, Anupam Kher, David Hamilton Productions. 2012.Film.
Mississippi Masala, Dir. Mira Nair. Denzel Washington, Roshan Seth, Sarita Choudhury, Charles S. Dutton, Cinecom Pictures. 1992, Film.
Monsoon Wedding, Dir. Mira Nair, Perf. Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Randeep Hooda, Rajat Kapoor, Vijay Raaz, Mirabai Films, 2001, Film.
Neutill, Rani, Bending bodies, borders and desires in Bapsi Sidhwa's Cracking India and Deepa Mehta's Earth in Ethnicity, Race and Migration, Yale University, New Haven, CT, USA Published online : 19 Apr 2010.
Salaam Bombay ! Dir. Mira Nair, Perf. Shafiq Syed, Chanda Sharma, Raghuvir Yadav, Nana Patekar, Irrfan Khan, Mirabai Films. 1988.Film.
Singh, J. Kaur. "Transnational Multicultural Feminism and the Politics of Location: Queering Diaspora in Nisha Ganatra's Chutney Popcorn, Deepa Mehta's Fire, And Shani Mootoo's Cereus Blooms At Night" in South Asian Review, Northern Michigan University 26:2, 148-161.
Stock, Femke, "Home and Memory" in Diasporas : Concepts, Intersections, Identities. Ed. Kim Knott, Sean McLoughlin, Zed Books, 2010.
The Namesake, Dir. Mira Nair, Perf. Tabu, Irrfan Khan, Kal Penn, Zuleikha Robinson, UTV Motion Pictures, 2007, Film.
Water, Dir. Deepa Mehta, Perf. Seema Biswas, Lisa Ray, John Abraham, David Hamilton Productions, 2005, Film.

Bio Note : Ananya Mukherjee is a Doctoral research scholar in the department of English, Raiganj University and presently teaching in Department of English, Sripat Singh College, Murshidabad. Her areas of interest include War literature, Partition literature, Film studies, Gender studies and Post-colonial literature. She has presented papers in many National and International seminars and conferences. She has written articles and has published chapters in books. She has authored P.G. module on American literature under UGC e-pathsala. She is currently working on a project as an Editor.

Ananya Mukherjee,
Research Scholar, Dept. of English Raiganj University
& State Aided College Teacher, Category- I,
Sripat Singh College, Jiaganj, Murshidabad.

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes. It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
    1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
    2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors
OPEN EYES
S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 17, No. 2, December 2020

Published by :
S.R.L. Mahavidyalaya, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only